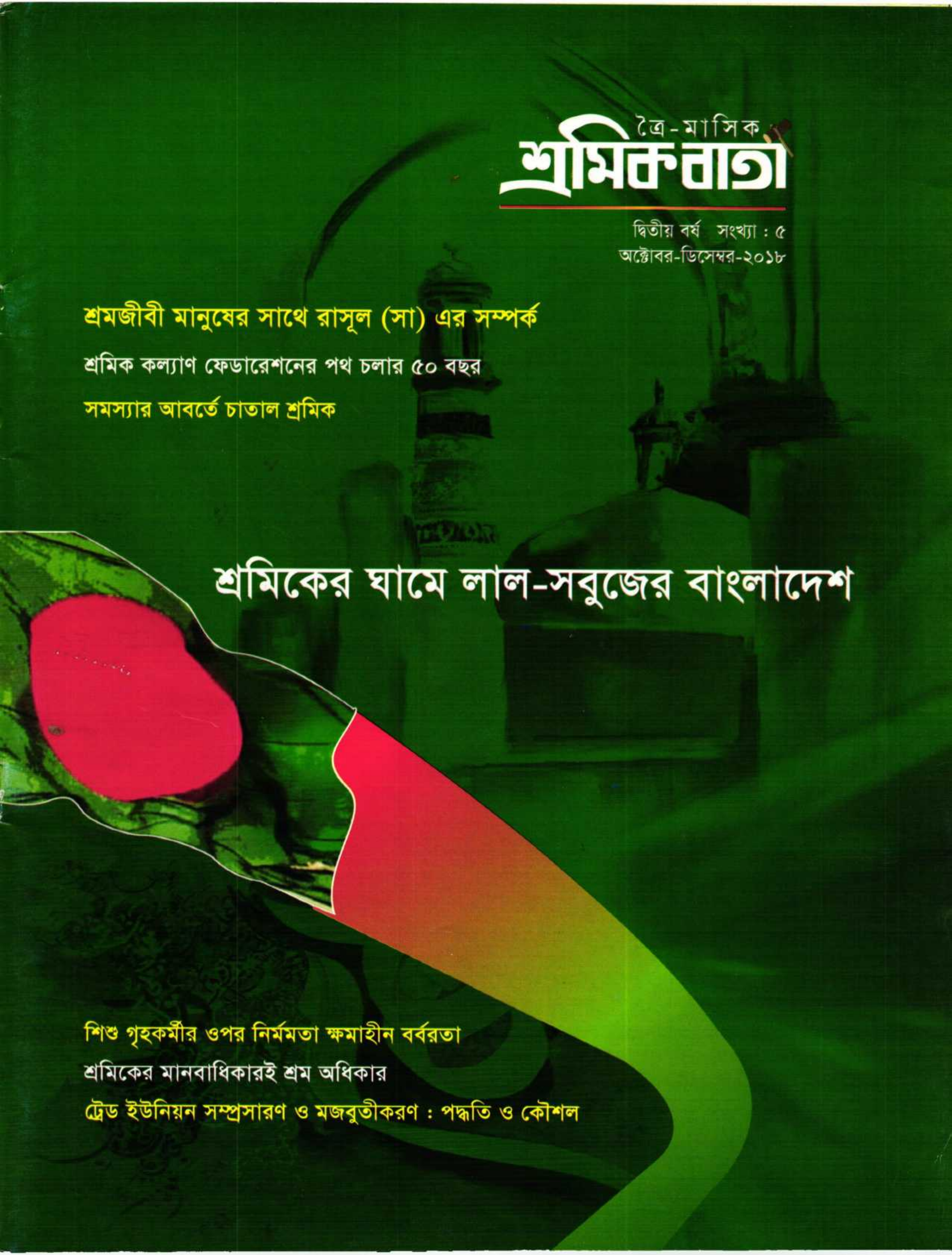

ত্রৈ-মাসিক

শ্রমিকবার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যা : ৫
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৮

শ্রমজীবী মানুষের সাথে রাসূল (সা) এর সম্পর্ক

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পথ চলার ৫০ বছর

সমস্যার আবর্তে চাতাল শ্রমিক

শ্রমিকের ঘামে লাল-সবুজের বাংলাদেশ

শিশু গৃহকর্মীর ওপর নির্মমতা ক্ষমাহীন বর্বরতা

শ্রমিকের মানবাধিকারই শ্রম অধিকার

ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারণ ও মজবুতীকরণ : পদ্ধতি ও কৌশল

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ০৫
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সম্পাদক
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

নির্বাহী সম্পাদক
আতিকুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
আবুল হাশেম
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন
মুহিব্বুল্লাহ
আশরাফুল আলম ইকবাল

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবু তাশরিন

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই উত্তম খাদ্য
মাওলানা আবুল হাসেম ৩

শ্রমিকের ঘামে লাল-সবুজের বাংলাদেশ
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ৫

শ্রমজীবী মানুষের সাথে রাসূল (সা) এর সম্পর্ক
মাষ্টার শফিকুল আলম ৯

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পথ চলার ৫০ বছর
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ১৩

সমস্যার আবর্তে চাতাল শ্রমিক
গোলাম রব্বানী ২০

শিশু গৃহকর্মীর ওপর নির্মমতা ক্ষমাহীন বর্বরতা
মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত ২৩

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান ২৬

শ্রমিকের মানবাধিকারই শ্রম অধিকার
শাহ মু. মাহফুজুল হক ৩০

শ্রমিক আন্দোলন ও ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন
লস্কর মোঃ তসলিম ৩৬

ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারণ ও মজবুতীকরণ : পদ্ধতি ও কৌশল
আতিকুর রহমান ৩৮

মূল্যবোধ একটি অত্যাবশ্যকীয় মানবিক গুণাবলি
ড. সৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী ৪১

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি আন্দোলন প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন ৪৫

মাসায়েল : সিরাতুন্নবী (সা)
মাওলানা রফিকুল ইসলাম মিয়াজী ৪৮

শ্রম আইনবিষয়ক কতিপয় পরিভাষা ৫০

শ্রম অধিদপ্তর পরিচিতি
আবুল হাসেম ৫১

ফেডারেশন সংবাদ ৫৫

সম্পাদকীয়

শ্রমিকের রক্তঘামে গড়ে ওঠে সভ্যতা; তৈরি হয় ইতিহাস। সৃজনের কারিগর ও মানবতার বন্ধু ওরা। তবুও সমাজে আর দশজন মানুষের মতো শ্রমিকরা যে মানুষ একথা প্রমাণ করতে অনেক কাঠ-খড়ি পোড়াতে হয়েছে। অন্যায়, বঞ্চনা ও যুলুমের বিরুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকদের ৮ কর্ম ঘন্টার দাবি নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়। তা একসময় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের মালিক পক্ষ। আর তখন থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এরপর শ্রমিকদের এ আন্দোলনকে পুঁজি করে ইসলাম বিদ্রোহী গোষ্ঠী সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ নামে নানা সংগঠনের ব্যানারে শ্রমিকদের নিয়ে স্বীয় দল ও মতাদর্শের কার্যক্রম চালায়। ফলে শ্রমিকরা মহান আল্লাহর শাশ্বত বিধিবিধানের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তারা শ্রমিজীবী মানুষদের ধোঁকা দেয়ার জন্য "দুনিয়ার মজদুর এক হও, শ্রমিক রাজ কায়েম কর" এই শ্লোগানের মাধ্যমে নিরীহ লোকদের উত্তেজিত করে তুলে। কিন্তু শতাব্দীকাল পরে আজও শোষিত, বঞ্চিত আর অবহেলিতদের প্রতীক বয়ে বেড়াচ্ছে তাঁরা। অথচ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ধোঁকাবাজরা যখন একচেটিয়া শ্রমিক ময়দান দখল করে নিল তখন শ্রমিকরা মনে করতো ইসলামে শ্রমজীবী মানুষের কোন মুক্তির পথ নেই। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালের ২৩ মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের যাত্রা শুরু হয়। যা আজ ৫০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পথে।

রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল ত এসব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? -ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান না'ক; কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে!
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!
(কাজী নজরুল ইসলাম)

মানবতার মহান বন্ধু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এ মাসেই পৃথিবীর বুকে আগমন করেছিলেন। তিনি শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ যারা মানুষের সুখের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদেরকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়, তারাতো মহান আল্লাহর কাছেও মর্যাদার অধিকারী। তিনি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থায় বুঝাতে সক্ষম হন যে, 'ইসলাম শ্রমিকের সঙ্গে কত সুন্দর মানবিক ও সম্মানজনক আচরণ দেখাতে পারে। তাঁর প্রতিটি কর্মকান্ডে মানুষের কল্যাণকর দিকগুলো সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রমের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কারো জন্য স্বহস্তের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য আর নেই। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ) স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহ করতেন। (বুখারি, মিশকাত হা/২৭৫৯)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন, আল্লাহ ঐ শ্রমিককে ভালবাসেন যে সুন্দরভাবে কার্য সমাধা করে। (জামে তিরমিযি হা/১৮৯১)

বিজয়ের উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত আজ বাংলার জনপদ। এই বিজয় কৃষক, শ্রমিক, কুলি-মজুর, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সকল শ্রেণীর মানুষের অবিরাম সংগ্রামের ফল। মুক্তিকামী জনতার রক্ত-খুন আর স্বজন হারানো বেদনার প্রহর গুনার ফসল। বিজয়ের ৪৭ বছর পেরিয়ে গেলেও বিজয়ের প্রকৃত স্বাদ পায়নি বাংলার মেহনতি মানুষ। আমাদের বহু পরে স্বাধীনতা অর্জন করে মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর কোথায় আর আমরা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিজয়কে যেমন এদেশের গানে গানে, কবিতা-ছড়ায়, গল্পমালায়, চলচ্চিত্রে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে, গণমাধ্যমে বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। তেমনি শ্রমিকদের নানান বিষয় ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিকদের মুখপত্র হিসেবে 'শ্রমিক বার্তা' প্রকাশ করে। এই ম্যাগাজিন শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে অনুপ্রেরণার জোগানদাতা। সাথে সাথে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অগ্রযাত্রায় অনন্য সারথি। একটি সোনার স্বদেশে সব ধরণের ইনসাফপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কলমসৈনিকদের আরো একধাপ এগিয়ে আসা প্রয়োজন। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে দল মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

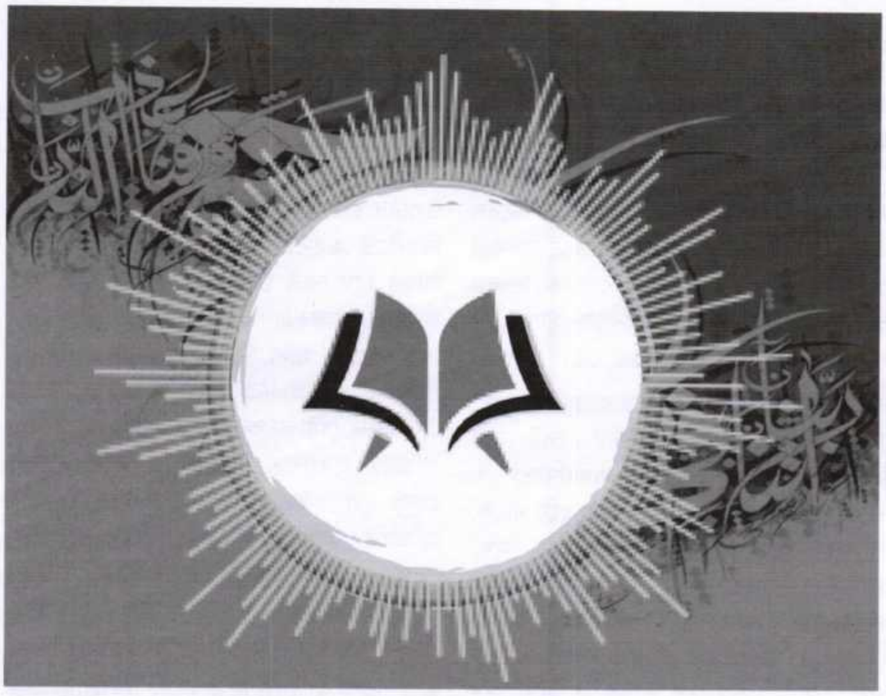

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যই উত্তম খাদ্য

মাওলানা আবুল হাসেম

মিকদাম (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। (বুখারী, ইফা : ১৯৪২)

রাবি পরিচিতি : অত্র হাদীসের সনদের শেষ স্তর প্রখ্যাত সাহাবী মিকদাম (রা) পর্যন্ত পৌঁছেছে যিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে শুনেছেন। তাঁর নাম- মিকদাম পিতা: মাদি কারাব ইবনে আমর আল কিনদি। মুয়াবিয়া (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও দানশীল। রাসূল (সা) থেকে তিনি চল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৮৭ হিজরিতে তিনি তদানীন্তন শাম নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

নিজ হাতে উপার্জন : আল্লাহ তায়ালা কোন মানুষকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হিসেবে সৃষ্টি করেননি। জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষকে কোন না কোন ভাবে অন্যের সহযোগিতা নিয়ে চলতে হয়। বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, গুণ, বিভিন্ন স্তরের সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। কুরআনের বাণী, "আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধীনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পার।" (সূরা যুখরুফ : ৩২) এটা না হলে নশ্বর এ পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম শৃঙ্খলাও ধ্বংসের কবলে পড়তে বাধ্য হতো। জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষ খাবার, পরিধান, বাসস্থানসহ নানামুখী চাহিদার জালে আটকাবদ্ধ। এসব চাহিদা আঞ্জাম দেয়ার নিমিত্তে তাকে বিভিন্ন কর্মে, শ্রমে আত্মনিয়োগ করে সম্পদ, অর্থ উপার্জন করতে হয়। মানবসভ্যতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী উপার্জনের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। কেউ জীবিকা নির্বাহ করছে চাকরির মাধ্যমে, কেউ করছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে, আবার কেউ দিয়ে যাচ্ছে অনবরত মেধাশ্রম। আর কেউ উপার্জনের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, গতর খেটে নিজ হাতে উপার্জন করে জীবন সংসার পরিচালনা করছেন।

খাবারে উত্তম অনুত্তমের তাৎপর্য : জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রতিটি প্রাণীকেই খাবার গ্রহণ করতে হয়। শুধু মানুষই খায় না, চতুষ্পদ জন্তুও খাবার গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মাঝে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নেয়ামত হলো ভালো-মন্দ, পবিত্র-অপবিত্র পার্থক্য করার জ্ঞান। সে জন্য আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ যা-ই পায় তা খায় না; সে বৈধ অবৈধের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। বিপরীতে পশু যা পায় তা-ই খায়; সে বৈধ অবৈধের মর্ম উপলব্ধি করার জ্ঞান রাখে না। অথচ মানুষদের মধ্যেও কিছু মানুষের নৈতিকতা এমন তলানিতে গিয়ে পৌঁছে; তখন সে ভালো-মন্দ যাচাই করার চিন্তা করে না। সেও চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় খায়। কুরআনের বাণী, "যারা কুফরি করে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান।" (সূরা মুহাম্মদ : ১২)

ইসলামী নৈতিকতার দাবি অনুয়ায়ী যে কোন ব্যক্তির ইবাদাত গ্রহণের পূর্বশর্ত হলো তার খাবার, পরিধেয়, জীবন ধারণ- বৈধ এবং উত্তম হওয়া। অনুত্তম, অপবিত্র খাবার দ্বারা গঠিত শরীরের ইবাদাত আল্লাহ তায়ালার নিকট কানাকড়ি মূল্যও নেই। রাসূল (সা) বলেছেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ তার রাসূলদেরকে যেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও সেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত।" (সূরা মুমিনুন : ৫১) আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে রিজিক দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর।' (সূরা বাকারাহ : ১৭২) বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সা. এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং সারা শরীর ধূলামলিন। সে আসমানের দিকে হাত দরাজ করে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন-জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দু'আ কিভাবে কবুল হতে পারে?" (তিরমিযি : ২৯৮৯)

উপার্জনের বিভিন্ন দিক : জীবনধারণের জন্য মানুষ যে পেশা গ্রহণ করে সেটাই তার উপার্জনের মাধ্যম। বৈধ হোক কিংবা অবৈধ হোক মানুষ বিভিন্নভাবে উপার্জন করেই থাকে। সব উপার্জনের মর্যাদা একই মানের নয়। কেউ চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ,

অন্যের সম্পদ হরণ ইত্যাদি মাধ্যমে উপার্জন করে জীবন পরিচালনা করছে, যা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। আবার কেউ ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করছেন, যা উত্তম, বৈধ এবং কল্যাণকর। এর মধ্যে যারা নিজ হাতে উপার্জন করে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে; রাসূল সা. সেটাকেই সর্বোত্তম খাদ্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

উত্তম খাদ্যের পরিচয় : রাসূল (সা) নিজ হাতে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা খাবার গ্রহণকে সর্বোত্তম খাবার হিসেবে গণ্য করেছেন। খাবার গ্রহণ ছাড়া পৃথিবীতে কেউই বেঁচে রয় না। বাঁচার তাগিদে সকলকে খাবার গ্রহণ করতে হয়। তবে যে উপার্জনকে কেন্দ্র করে মানুষ খাবার গ্রহণ করে সে উপার্জনের মাধ্যম কিন্তু সবার একই রকম নয়, অধিকন্তু এ ভিন্নতার কারণে তাদের অনূভূতিতেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কেউ খাবার খাচ্ছেন মেধাশ্রমের মাধ্যমে, আবার কেউ খাচ্ছেন ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি, যোগ্যতা খাটিয়ে যে ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জন করে খায়, নিজের পায়ে নিজে বুকটান হয়ে দাঁড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে; বিপরীতে যে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে হাত পাতে- দু জনের অনুভূতি কস্মিনকালেও সমান হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার কাছেও দু'জনের মর্যাদা ভিন্নতর হয়ে থাকে। একজন লাভ করে মহান রবের বন্ধু হওয়ার গৌরব আর অপরজন পরকালে উত্থিত হতে হবে লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়। রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সবসময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না।" (বুখারী, ই.ফা:১৩৮৬)

দাউদ (আ.) এর কাজ : দাউদ (আ.) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার মনোনীত নবী। নবীগণ গোটা সৃষ্টিজগতের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরকে নিজ গায়েবি খাজানা থেকে অঢেল সম্পদের মালিক বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণ যেহেতু গোটা বিশ্ব মানবতার অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেহেতু তারা অকর্মণ্য, অলস হয়ে শুধু আল্লাহ তায়ালার ঐশ্বরিক সহযোগিতার আশায় বসে থাকেননি। বরং তারাও শারীরিক পরিশ্রম করে, নিজ হাতে উপার্জন করে কিয়ামাত পর্যন্ত অনাগত সকল মানুষের সামনে শ্রমের মর্যাদাকে অতীব সম্মানিত করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় দাউদও (আ.) নিজ হাতে বর্ম তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কুরআনের বাণী, "আর অবশ্যই আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আমি আদেশ করলাম) হে পর্বতমালা, তোমরা তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখিদেরকেও (এ আদেশ দিয়েছিলাম)। আর আমি তার জন্য লোহাকেও নরম করে দিয়েছিলাম (এ নির্দেশ দিয়ে যে) তুমি পরিপূর্ণ বর্ম তৈরি কর এবং যথার্থ পরিমাণে পরিশ্রম কর। আর তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা সাবা : ১০, ১১)

নিজের কাজে লজ্জা নেই : কাজ, পরিশ্রম, চেষ্টা- এগুলোর মাঝে লজ্জা নেই। নেই কোন হীনমন্যতা। লজ্জা আছে অকর্মণ্যতা ও বৈরাগ্যবাদের মাঝে। প্রবাদে বলা হয়ে থাকে, 'পরিশ্রমে ধন আনে, পুণ্যে আনে সুখ; অলসতায় দরিদ্রতা আনে, পাপে আনে দুঃখ।' একইভাবে মানবজীবন ঘনিষ্ঠ বিধান ইসলামেও পরিশ্রমের ব্যাপারে যথেষ্ট তাকিদ দেয়া হয়েছে। ঈমানের পরেই যে সালাতের মর্যাদা ইসলামে স্বীকৃত সে সালাতের পর মসজিদে বসে না থেকে বরং উপার্জনের লক্ষ্যে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে কুরআনে নির্দেশনা রয়েছে। কুরআনের বাণী, "অতঃপর যখন সালাত সম্পন্ন হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।" (সূরা জুমা : ১০) বিশ্বনবী মুহাম্মদও (সা) নিজ হাতে কর্ম করে খেয়েছেন। এতে তিনি লজ্জাবোধ করেননি। তিনি ছাগল চরিয়েছেন; এবং তা তিনি ঘোষণা করতেও হীনমন্যতায় ভুগেননি। বরং তা প্রকাশ করে তার অমর আদর্শের স্বাক্ষর রেখেছেন। রাসূল সা. বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরি না চরিয়েছেন। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কিরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।" (বুখারি, ই. ফা: ২১১৯)

উপরের হাত নিচের হাত : এ পৃথিবীতে প্রত্যেকেই দাতা আবার প্রত্যেকেই গ্রহীতা। কেউ অধঃস্তনকে দিচ্ছেন আবার তিনিই উর্ধ্বতন থেকে গ্রহণ করছেন। চূড়ান্তদাতা হলেন আল্লাহ তায়ালা। যার সাথে কারো তুলনা চলতে পারে না। কুরআনের বাণী, "তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী।" (সূরা নাহল : ৯৬) আল্লাহ তায়ালাই অমুখাপেক্ষী আর গোটা সৃষ্টি অসহায়, অভাবী। কুরআনের বাণী, "হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।" (সূরা ফাতির : ১৫) তথাপি মানুষের মাঝে যোগ্যতা, দক্ষতা, আন্তরিকতা, পরিশ্রমপ্রিয়তা, কর্মতৎপরতা ও মন-মানসিকতার পার্থক্যের কারণে কেউ দাতা হয়ে তৃপ্তি অনুভব করেন। যাদেরকে রাসূল (সা) উপরের হাত ঘোষণা করে সম্মানিত করেছেন। বিপরীতে অলসতা, হীনমন্যতা ও অকর্মণ্যতায় আড়ষ্ট হয়ে কেউ কেউ গ্রহীতা হওয়াকেই নিজ জীবনের বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তারা কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর হিম্মত রাখে না। তারা নিজ হাতে, নিজ তৎপরতায় উপার্জনের চেষ্টা না করে অন্যের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় দিনাতিপাত করে থাকে। রাসূল (সা) তাদেরকে নিচের হাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, "উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। উপরের হাত হলো- দানকারী আর নিচের হাত হলো- ভিক্ষুক।" (বুখারি, ই.ফা: ১৩৪২)

কাঠ কেটে খাওয়া: ভিক্ষাবৃত্তির বিপরীতে নিজ হাতে উপার্জনের ব্যাপারে রাসূলের (সা) সে ঐতিহাসিক নির্দেশনা, পদক্ষেপ আজও পৃথিবীর ইতিহাসে খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে অনবদ্য প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। সুস্থ সবল এক ব্যক্তিকে যখন রাসূল (সা) ভিক্ষা করতে দেখছিলেন, তখন তাকে হাতে কুড়াল তুলে দিয়ে নিজ হাতে উপার্জনের রাস্তা বাতলে দিয়েছিলেন। যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। রাসূল (সা) প্রেরণা দিতে গিয়ে বলেছেন, "তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ি সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া কারো নিকট হাত পাতার চেয়ে উত্তম। (কারণ) কেউ দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।" (বুখারি, ই.ফা: ১৯৪৪)

হাদীসের শিক্ষা

১. চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় শুধু খেলেই হবে না বরং ভক্ষিত খাবার বৈধ কিনা তা যাচাই করতে হবে।

২. বৈধ খাবারের মাঝেও উত্তম, অনুত্তম, সর্বোত্তম বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য।

৩. নবীগণও যেহেতু নিজ হাতে কর্ম করে খেতেন; সে কারণে এর মাঝে লজ্জা, হীনমন্যতার কোন কারণ নেই।

৪. অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্তির আশা না করে বরং অন্যকে কিছু দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করার মানসিকতা অর্জন করা উচিত।

লেখক : *ইসলামী চিন্তাবিদ*

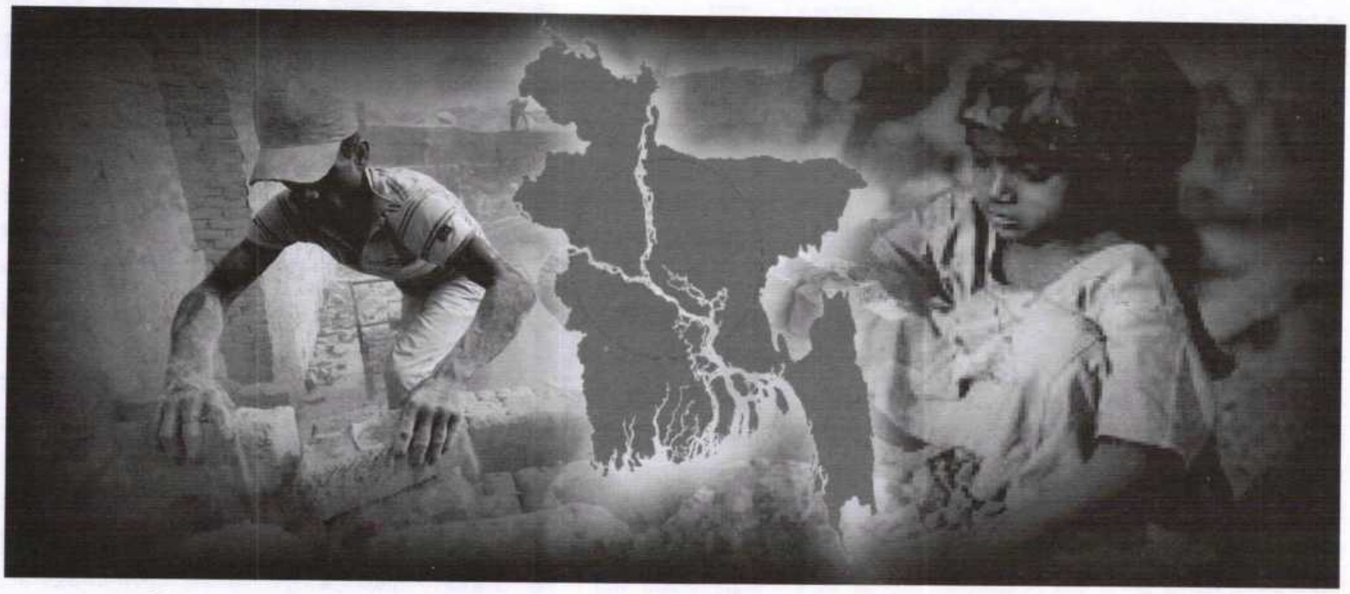

শ্রমিকের ঘামে লাল-সবুজের বাংলাদেশ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন কিন্তু শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ব্যবসায়ের নাম করে আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল অনেক বেনিয়া। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার এবং ইংরেজসহ অনেক ধান্দাবাজ গ্রুপ। এদের মধ্যে পর্তুগিজদের হাতে আমাদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। আরাকানের মগদের সাথে মিলিত হয়ে তারা আমাদের দেশকে লুট করে নিতো। হাজার হাজার যুবক যুবতীকে অপহরণ করে বহু দূরে নিয়ে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করতো। তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই 'মগের মুল্লুক' শব্দটির প্রচলন হয়ে এসেছে। তবে ওরা অনেক চেষ্টা করেও এদেশের শাসনক্ষমতা হাতে নিতে পারেনি। আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল ইংরেজ কোম্পানি। এদের হাত ধরেই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে ব্রিটিশ শাসন। একশো নব্বই বছর ধরে ওরা আমাদের শোষণ-বঞ্চনার শিকলে বেঁধে রেখেছিল।

কৃষক-শ্রমিক নদীমাতৃক ও কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অগ্রনায়ক। আবহমান বাংলার সমৃদ্ধির ইতিহাসে তাঁদের শ্রমের কথাই উঠে এসেছে বারবার। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলার পাল, সেন, সুলতানি, মুগল, ব্রিটিশ, পাকিস্তান এমনকি বাংলাদেশের ইতিহাস বিনির্মাণে এ খেটে খাওয়া মানুষগুলোই সোনালি অধ্যায়ের নির্মাতা। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে আমরা যে বিজয়পতাকা উড়িয়েছি সেখানেও তাঁদের ঘাম লেগে আছে। বাংলাদেশের এ সকল খেটে খাওয়া মানুষগুলোই মহান মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগী সৈনিক। কলকাতাকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধার কথা তাদের মাথায় ঢোকেনি কখনো। তাঁরা কখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা চিন্তা করেননি। চেয়েছিলেন জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনভাবে ন্যায্য পারিশ্রমিকে কাজ করার অধিকার। এ সকল খেটে খাওয়া মানুষের সাথে দেশের অভিজাত শ্রেণির মানুষেরাও নেমে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। হাজারো প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় মুক্তির লাল সূর্য, স্বপ্নের স্বাধীনতা, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় লাল- সবুজের পতাকা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন কিন্তু শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ব্যবসায়ের নাম করে আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল অনেক বেনিয়া। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার এবং ইংরেজসহ অনেক ধান্দাবাজ গ্রুপ। এদের মধ্যে পর্তুগিজদের হাতে আমাদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। আরাকানের মগদের সাথে মিলিত হয়ে তারা আমাদের দেশকে লুট করে নিতো। হাজার হাজার যুবক যুবতীকে অপহরণ করে বহু দূরে নিয়ে দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করতো। তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই 'মগের মুল্লুক' শব্দটির প্রচলন হয়ে এসেছে। তবে ওরা অনেক চেষ্টা করেও এদেশের শাসনক্ষমতা হাতে নিতে পারেনি। আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল ইংরেজ কোম্পানি। এদের হাত ধরেই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে ব্রিটিশ শাসন। একশো নব্বই বছর ধরে ওরা আমাদের শোষণ-বঞ্চনার শিকলে বেঁধে রেখেছিল।

ব্রিটিশরা ছিল খুব কৌশলী। ওরা নিজেরা কোন দোষ ঘাড়ে নিতো না। মুসলিম শাসনামলে আমাদের দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে মিল ছিল। হিন্দু-মুসলমানদের কোন ধরনের রেষারেষি, বিভেদ কিংবা কোন রকম গণ্ডগোল ছিল না। সবাই মিলে মিশে থাকতো। যার যার ধর্ম সবাই স্বাধীনভাবে পালন করতো। সুখ দুঃখে সবাই এক হয়ে থাকতো। সুলতান, সম্রাট, কিংবা নবাবগণ দেশ পরিচালনা করলেও সাধারণ জনগণ রাজনীতির ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করতো না। তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে

নিজেদের জীবন-জীবিকা পরিচালনা করতো। কিন্তু সুকৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তৈরি করে দেয় ব্রিটিশরা। হিন্দুদেরকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়ার নামে তাদেরকে মুসলিমবিদ্বেষী করে তোলে। অন্য দিকে মুসলমানদের ক্ষমতাই শুধু কেড়ে নেয়নি, চাকরি-বাকরি ও লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা থেকে শুরু করে সব ধরনের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে। সেইসাথে পিছিয়ে পড়া অসহায় মুসলমান জাতির ওপর চাপিয়ে দেয় নানা ধরনের খাজনা, ট্যাক্স এবং সেলামি। তখন দাড়ি রাখলে কিংবা টুপি পরলে কিংবা মসজিদে আজান দিতেও খাজনা দিতে হতো। মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করাও কষ্টকর ছিল। ফলে প্রায় সকল মসজিদেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরিবর্তে শুধুমাত্র জুমার দিনেই নামাজ আদায় করা হতো। দেশের বিভিন্ন স্থানে জুমাও আদায় করা হতো ট্যাক্স দিয়ে। ফলে মসজিদগুলো নামাজশূন্য হয়ে পড়ে। আর শুধুমাত্র জুমার নামাজ আদায় করা হতো বলে মসজিদকে জুমাঘর বলে আখ্যায়িত করা হতো। এখনও উত্তর বাংলার বিভিন্ন জনপদে মসজিদকে জুমাঘর নামেই ডাকা হয়। মুসলমান ঘরে সন্তানদের আকিকা দিয়ে মুসলমানি নাম রাখতেও খাজনা দিতে হতো। খাজনা না দিলে মুসলিম ছেলে-মেয়েদের বিয়ে শাদিও দেয়ার অনুমতি ছিল না। এভাবে স্বাধীনতা শব্দটি মুসলমানদের জীবন থেকে পুরোপুরিভাবে হারিয়ে যায়। অবশেষে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে গর্জে ওঠেন অনেকেই। মীর নেসার আলী তিতুমীর গড়ে তোলেন 'বাঁশের কেল্লা'। দলবলসহ শহীদ হয়ে তিনি প্রমাণ করে গেলেন 'জীবনের চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি'। এ ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন হাজী শরীয়তুল্লাহ, ফকির মজনু শাহ, সৈয়দ আহমদ বেরলভিসহ বালাকোর্টের হাজারো শহীদ এবং গাজী। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয় 'সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, যা 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। তবুও স্বাধীনতার সূর্যের দেখা পাইনি আমরা। অবশেষে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন ও মুন্নুজানের মতো বেশকিছু দানবীরের শিক্ষা বিস্তার প্রয়াস এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের মতো বিদুষী নারীদের প্রচেষ্টার পাশাপাশি স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলীর মতো কিছু চিন্তাশীল মানুষের ঐকান্তিক সাধনায় আমরা আরো একধাপ এগিয়ে যাই স্বাধীনতার পথে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত বাংলা বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে ঢাকা হয়ে ওঠে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। আবারো জেগে ওঠে মুসলমানরা। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নিজেদের অবস্থান ফিরে আনার চেষ্টা চলে প্রাণপণে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নানামুখী আন্দোলনে ১৯১১ সালেই তা রদ করা হলেও মাত্র ছয় বছরেই বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্নকে দৃঢ় করতে পেরেছে। মুসলিম লীগসহ নানা ধরনের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বপ্নের 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ বাংলার অনেক নেতা গর্জে ওঠেন স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে। অবশেষে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত মানুষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সূর্যের দেখা পায়। প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নিজেদের বোধ-বিশ্বাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু অচিরেই পাকিস্তানি শাসকরাও বৈরী আচরণ শুরু করে আমাদের সাথে। প্রথমেই আঘাত হানে আমাদের মাতৃভাষার ওপর। আমরা অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম শুরু থেকেই। তাইতো পাকিস্তান স্বাধীন হবার সাথে সাথেই বাংলাভাষার অধিকার আদায়ের দাবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান তমুদ্দন মজলিস'। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক আবদুল গফুরসহ অসংখ্য গুণী বুদ্ধিজীবী এ মজলিসে শরিক হন। কবি ফররুখ আহমদসহ সাহিত্যিক মহলে এবং তৎকালীন ছাত্রনেতা গোলাম আযমসহ রাজনৈতিক অঙ্গনে ভাষার দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অচিরেই দানা বেঁধে ওঠে ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে শহীদ হন আবদুস সালাম, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, শফিউর রহমান, রফিকউদ্দিন আহমেদসহ অনেকে। স্বাধীন পাকিস্তানে বসবাস করেও আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আমরা পূর্ববাংলায় একচ্ছত্র বিজয়সহ সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও তারা আমাদের হাতে ক্ষমতা দিতে চায়নি। আমরাও ছিলাম দৃঢ়প্রত্যয়ী। তাইতো আবারো আমাদের গর্জে ওঠা স্বাধীনতার জন্য। অবশেষে আমাদের রাজনীতি আর ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। পরিণত হয় স্বাধীনতার সংগ্রামে। তারপর মুক্তিযুদ্ধ। ডিসেম্বরে বিজয়ের উল্লাস।

মানবতার মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন ছিল শক্তিশালী। সেকালের শ্রমিকনেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আত্মত্যাগ এখনকার ভাগ্যবান নেতারা ভাবতেও পারবেন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন'। তার নেতৃত্বে ছিলেন ডা: আবদুল মোতালেব মালিক ও আলতাফ আলী। অবিভক্ত ভারতবর্ষে তাঁরা কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন', যার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মওলানা ভাসানী এবং সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা ও সাধারণ সম্পাদক স্টিমার শ্রমিকনেতা কাজী মহিউদ্দিন। কমিউনিস্ট নেতাদের অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর এর অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। ষাটের দশকে আইয়ুবের সময় গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদ'। ১৯৬৬ সালে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন', যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা ভাসানী। ষাটের দশকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প- কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকায় শিল্পশ্রমিকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের অধীনে পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকল, কাগজ, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। শ্রমিকনেতারা তাঁদের সংগঠিত করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৯৭০ সাল নাগাদ শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিপুল শক্তি অর্জন করে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের শক্তির প্রকাশ ঘটে। এই আন্দোলনে সব ট্রেড ইউনিয়ন একাত্মতা ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। কলকাতায় গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিকনেতা। স্বাধীনতার পরে সব শিল্পকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিতে সেগুলোর শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। আগের শ্রমিকনেতারাই শ্রমিকস্বার্থে আন্দোলন-সংগ্রাম করেন; কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। মুদ্রাস্ফীতির কারণে তাঁদের জীবনযাত্রা নির্বাহে অবনতি ঘটে। ঐতিহ্যবাহী পাটকল, সুতাকল, কাপড় কল, চিনিকল প্রভৃতি বন্ধ হয়ে গেলেও আশির দশকে তৈরি পোশাকশিল্পের বিস্তার ঘটে। বাংলাদেশের শ্রমজগতে আসে বৈপ্লবিক

পরিবর্তন। তৈরি পোশাকশিল্পের আগে নারীশ্রমিক ছিল না। লাখ লাখ নারী আজ এই শিল্পে নিয়োজিত। এখনই প্রয়োজন ছিল নির্লোভ, সৎ ও নিবেদিত নেতৃত্বের।

আমাদের বাংলাদেশ মহান বিজয়ের সাড়ে চার দশক পার করে পাঁচ দশক পূর্ণ করতে যাচ্ছে। এ সময় একেবারে কম সময় নয়। কিন্তু আজো আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। সামাজিক-রাজনৈতিক, শিক্ষা, মানবাধিকার ও আইনের শাসনজনিত গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিও অত্যন্ত নাজুক। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের শপথও ছিল তার মধ্যে। 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা' এসব ক্ষেত্রে এতো বছরেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কেন রাজনৈতিক জটে আটকে থাকবে এ জিজ্ঞাসাও অযৌক্তিক নয়। বিদেশ থেকে যারাই এ দেশে বেড়াতে আসেন, প্রত্যেকেই এ দেশ দেখে মুগ্ধ হন। এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের মন হরণ করা ব্যবহার, অতিথিপরায়ণতা এবং আহার-বিহার সবই নজরকাড়া। সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ এ বাংলা। বাংলার সম্পদ, এর সবুজ-শ্যামলী, নদ-নদী, পাহাড়-হ্রদ-জলের প্রপাত, সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন সবই সৃষ্টিকর্তার অশেষ দান। এমন একটি দেশ এগিয়ে যাবে না এ কথা বিশ্বাস করতে ভীষণ কষ্ট হয়।

বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ, এ কথা বারবার উচ্চারিত হয়ে আসছে। এই সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা পাবে বা বাস্তবায়ন ঘটবে তার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, নারীর অধিকার সংরক্ষণ, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ এবং দেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলাসহ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার মধ্য দিয়ে। দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সে জন্য প্রয়োজন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা ও মানসিকতার পরিবর্তন, প্রয়োজন দেশে রাজনৈতিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনা। আর এটা পারবে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোই। মালয়েশিয়া ঘুরে দাঁড়াল, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম ২৫ বছর যুদ্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল, জাপান আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হয়েও ঘুরে দাঁড়াল, আমরা পারব না কেন? আমাদেরও পারতে হবে। গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কেবল তাহলেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

গণমাধ্যম যেমন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার নিয়ামকশক্তি, তেমনি দেশকে শীর্ষসন্ত্রাসী কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিত করেও তুলতে পারে। এমনকি খবরদারির এ আধুনিক বিশ্বে পাকিস্তান, ইরাক কিংবা আফগানিস্তানের মতো আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিতেও বিদেশী শক্তির আগমনের পথ সুগম করতে গণমাধ্যম দুঃখজনক ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে আমাদের সচেতন ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা এতো বড় সর্বনাশ হবে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। তবুও কথা থেকে যায়; কেননা এটা অস্বাভাবিক নয় এ জন্য যে, এক সিরাজের পাশে থাকে হাজারো মীরজাফর। ফলে স্বপ্নের পলাশী হয়ে পড়ে পরাধীনতার শৃংখল এবং নীরবে কেঁদে বেড়ায় মূল্যবোধের সজীব আত্মা। এ চাওয়া পাওয়ার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য চাই মনুষ্যত্ব অর্জন; আর এর জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ ও নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ তৈরির জ্ঞান। সরকার যদি আন্তরিক হন, নেতা-নেত্রীরা যদি সত্যিকার রাজনীতি করেন তাহলে দেশের পরিবেশও সুন্দর থাকবে। এ জন্য প্রয়োজন সকলের সচেতনতা এবং সহনশীল মানসিকতা। বর্তমান দেশের পরিস্থিতি জাতিকে শুধু ভাবিয়েই তোলেনি বরং ব্যাপকভাবে হতাশও করেছে। আমরা নতুন করে কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর নামে নতুন কোন ওসমান, শতকী কিংবা হাজারী দেখতে চাই না; দেখতে চাই দেশ গড়ার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। ইতঃপূর্বে দেশবাসী দেখেছে কিভাবে প্রকাশ্য রাজপথে মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশের ওপর নাচানাচি করা হয়েছে। কিভাবে বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিভাবে বিরোধী দলের সকল কর্মসূচিতে বাধা প্রদান করা হচ্ছে তা জাতির কাছে স্পষ্ট। দৈনিক আমার দেশ, দিগন্ত টেলিভিশন, ইসলামিক টেলিভিশনসহ দেশের জনপ্রিয় কয়েকটি গণমাধ্যমকে কিভাবে বিনা অপরাধে কোন ধরনের আইনি নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই শুধুমাত্র গায়ের জোরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমই উৎকৃষ্টতম মাধ্যম। তাদের দিকনির্দেশনায় সরকার ও বিরোধীদলসহ সকল জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম মৌলিক ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান

ষাটের দশকে আইয়ুবের সময় গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদ'। ১৯৬৬ সালে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন', যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা ভাসানী। ষাটের দশকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প-কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকায় শিল্পশ্রমিকের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের অধীনে পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকল, কাগজ, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। শ্রমিকনেতারা তাঁদের সংগঠিত করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৯৭০ সাল নাগাদ শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিপুল শক্তি অর্জন করে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের শক্তির প্রকাশ ঘটে। এই আন্দোলনে সব ট্রেড ইউনিয়ন একাত্মতা ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তারা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। কলকাতায় গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিকনেতা।

উনিশ শতকে আধুনিক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উপমহাদেশে তথা বাংলায় শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা শুধু অর্থনীতিতে নয়, রাজনীতিতেও গৌরবের। শ্রমিকশ্রেণির অংশ-গ্রহণ ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সফল করা শুধু মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণে রাজনীতিবিদদের পক্ষে সম্ভব হতো না। পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকাও অবিস্মরণীয়। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিক ও ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রমজীবী মানুষ এবং তাঁদের পরিবারের সন্তানেরাই বেশি। তাঁরা অকাতরে জীবন দিয়েছেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ শুধু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ছিল না, তা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। বাংলাদেশে স্বাধিকার সংগ্রাম ও স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ত্যাগের পরিমাণ যতটা, প্রাপ্তির পরিমাণ তাঁর কিঞ্চিৎও নয়। বিজয় দিবসে শ্রমিকদের জন্য এখনই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়।'

প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে– এমন প্রত্যাশা সকলের।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিকে তাকালে আমাদের বিজয় দিবসের উল্লাস ম্লান হয়ে আসে। বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির আধিপত্য আমাদের স্বদেশজুড়ে। টিভি খুললেই ভিনদেশী চ্যানেলের আধিপত্য। বিনোদন মানেই ভিন্ন ভাষার গান-নাটক-সিনেমা। সংস্কৃতি মানেই অবিশ্বাসী ঘরানার মডেল। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নামে হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে যে ভাষাগত-সাংস্কৃতিক কালো থাবা আমাদের ওপর পড়েছে তা উদ্ধারের কোন বিকল্প নেই। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এ থাবায় অনেকাংশেই পঙ্গু হয়ে গেছে। সেখানকার শিশুরা এখন আর বাংলাভাষা বলতেই পারে না বলা চলে। অফিসার থেকে শুরু করে মুদি দোকানদাররা পর্যন্ত সে জালেই বন্দি হয়ে পড়েছে। তাদের মুখে হয়তো হিন্দি নতুবা ইংরেজি। বাংলাভাষার জন্য এখন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করতে পারে একমাত্র বাংলাদেশই। সে বাংলাদেশে যেভাবে ডোরেমন, মটুপাতলুর আগ্রাসন চলছে তাতে শিশুরা যেমন বাংলার চেয়ে হিন্দিতেই বেশি পারদর্শী হয়ে পড়েছে তেমনি হিন্দি গান ও সিনেমার কবলে বাংলাদেশের যুবসমাজও আটকে গেছে বলা চলে। হিন্দি ও পশ্চিম বাংলার সিরিয়ালে নারীদের মনমস্তিষ্ক আটকে যাবার কারণে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের কাছে ঐতিহ্যের কোন শিক্ষা পাচ্ছে না। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং নিরাশার কালো অধ্যায়। আজো আমরা তাকাতে পারিনি আমাদের বুকের দিকে। আজো আমাদের শেকড়ের প্রতি আস্থাবান হতে পারিনি। বাংলাদেশে অভিজাত পল্লীতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর দৌরাত্ম্যে বাংলা ভাষা এখন কোণঠাসা হতে শুরু করেছে। নিজেদের তাহজিব-তমদ্দুন ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি এখনো আমাদের অবহেলা বিদ্যমান।

সুবিধাবাদী নেতৃত্ব নিজেদের কল্যাণ করে নেন শ্রমিকদের ব্যবহার করে। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে হলে শ্রমিকশ্রেণির কথা ভাবতে হবে। কোনো কারণে তৈরি পোশাকশিল্প খাতে বিপর্যয় দেখা দিলে তাঁরা চাকরিপূর্ব জীবনের চেয়ে শোচনীয় অবস্থায় পড়বেন। শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা ও ভালো জীবনের নিশ্চয়তা না দিলে শুধু অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে না, রাজনৈতিক অস্থিরতা তো বটেই সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হবে। তাই সৈয়দ আবুল মকসুদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতেই পারি– উনিশ শতকে আধুনিক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উপমহাদেশে তথা বাংলায় শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা শুধু অর্থনীতিতে নয়, রাজনীতিতেও গৌরবের। শ্রমিকশ্রেণির অংশগ্রহণ ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সফল করা শুধু মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণে রাজনীতিবিদদের পক্ষে সম্ভব হতো না। পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকাও অবিস্মরণীয়। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিক ও ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রমজীবী মানুষ এবং তাঁদের পরিবারের সন্তানেরাই বেশি। তাঁরা অকাতরে জীবন দিয়েছেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ শুধু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ছিল না, তা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। বাংলাদেশে স্বাধিকার সংগ্রাম ও স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির ত্যাগের পরিমাণ যতটা, প্রাপ্তির পরিমাণ তাঁর কিঞ্চিৎও নয়। বিজয় দিবসে শ্রমিকদের জন্য এখনই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়।'

পরিশেষে বলতে পারি, বিজয়ের দীর্ঘ পদযাত্রায় অনেক অর্জনের মাঝেও নিরাশার কালো মেঘ মাঝে মধ্যেই দানা বাঁধে মনের আকাশে। এখনো হতাশাগ্রস্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক সিপাহসালার। এখনো আমরা মাথা উঁচু করে ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা বলতে ব্যর্থ হচ্ছি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে না পারলে কিসের স্বাধীনতা– কিসের গণতন্ত্র! স্বাধীনতা মানেইতো ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরে পাওয়া। স্বাধীনতা মানেই তো দেশের কল্যাণে নিজের কল্যাণ খোঁজা। স্বাধীনতা মানেই নিরাপত্তার গ্যারান্টি। স্বাধীনতা মানেই বিশ্বাসের পতাকা হাতে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে সামনে এগিয়ে চলা। স্বাধীনতা মানেই আমার সবুজ স্বপ্নের বিনির্মাণ। এ স্বাধীনতা অর্জনে গণতন্ত্রের সঠিক প্রমাণে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। আর এ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সফলতা আনতে হলে অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কৃষক-শ্রমিকসহ সকল মেহনতি মানুষকেও দাঁড়িয়ে যেতে হবে অধিকার আদায়ে। বিজয়ের মাসে এখনই সময় দাঁড়িয়ে যাবার।

লেখক : কবি ও গবেষক

প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

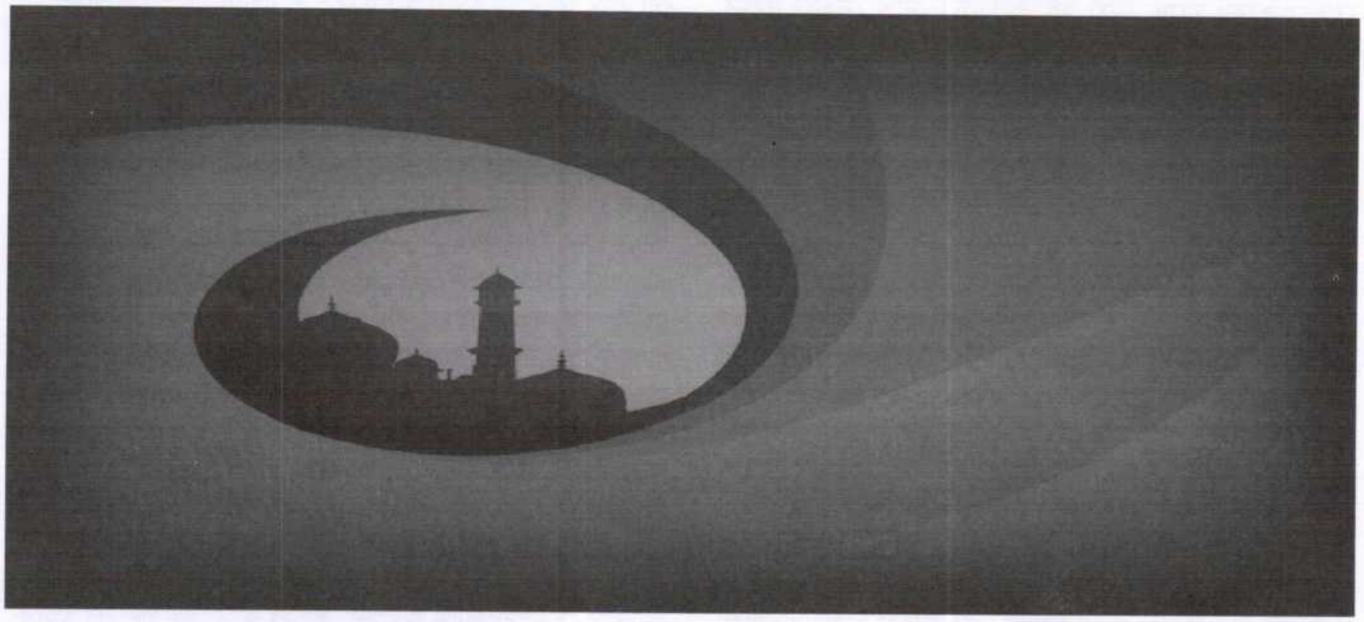

শ্রমজীবী মানুষের সাথে রাসূল (সা)-এর সম্পর্ক

মাষ্টার শফিকুল আলম

মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। সব ধরনের শ্রমিককেই মর্যাদা দিতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয়, আমাদের দেশে সেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় না। একজন দিনমজুরের শ্রম, কৃষকের শ্রম, শিক্ষকের শ্রম, অফিসারের শ্রম, ব্যবসায়ীর শ্রম– সবই সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, "অতঃপর যখন নামায শেষ হবে, তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং রিযিক অন্বেষণ কর।" (সূরা জুমা : ১০)

প্রতি বছর সিরাতুন্নবী মাসে আমরা মুসলমান হিসেবে রাসূল (সা)-এর সিরাতের ওপরে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করি এবং শুনে থাকি। কিন্তু যাদের হাতে সভ্যতার উত্থান সেসব শ্রমজীবী মানুষের সাথে আমাদের প্রিয়নবী রাসূল (সা) কেমন আচরণ করেছেন, তাদের মর্যাদা এবং অধিকারের ব্যাপারে তিনি কী ভূমিকা রেখেছেন এ বিষয়ে আমাদের সবারই জানা দরকার। শ্রমজীবীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র কোরআনে যেমন মানুষকে সতর্ক করেছেন, ঠিক তেমনি আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা) নিজেই তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তাদের অধিকার সম্পর্কে যে কথা বলেছেন এবং তাদের ব্যাপারে যে হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে কঠোর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে সে ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, মুসলমান হিসেবে যা আমাদের সবারই জানা দরকার। আমরা আল্লাহর ইবাদত বিশেষ করে মৌলিক এবাদতের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের অধীনস্থ যারা আছে তাদের ওপরে আমাদের যে দায়িত্বের কথা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল বলেছেন তা আমাদের জানা দরকার এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তা বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের সচেতন থাকা দরকার যাতে আমাদের আল্লাহর একজন গোলাম হিসেবে হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে কঠিন শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়।

মানুষ জীবনধারণের জন্য যেসব কাজ করে, তাকে শ্রম বলে। মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকার, পরিবারকে ভরণ-পোষণের, অপরের কল্যাণে এবং সৃষ্ট জীবের উপকারে যে কাজ করে, তা-ই শ্রম। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নর-নারী নির্বিশেষে সব মানুষই কোনো না কোনো কাজ করে। আর যে কোনো কাজ করতে গেলেই প্রয়োজন হয় শ্রমের। এ হিসেবে পৃথিবীর সব মানুষকেই শ্রমিক হিসেবে অভিহিত করা যায়।

অর্থনীতির পরিভাষায়, যারা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানায় কর্মকর্তার অধীনে শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন, তারাই শ্রমিক-শ্রমজীবী মানুষ। আর যারা শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করেন, তাদের নিকট থেকে যথাযথভাবে কাজ আদায় করেন এবং শ্রমের বিনিময়ে মজুরি বা বেতনভাতা প্রদান করেন, তারাই মালিক।

মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। সব ধরনের শ্রমিককেই মর্যাদা দিতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে

যেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয়, আমাদের দেশে সেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় না। একজন দিনমজুরের শ্রম, কৃষকের শ্রম, শিক্ষকের শ্রম, অফিসারের শ্রম, ব্যবসায়ীর শ্রম– সবই সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, "অতঃপর যখন নামায শেষ হবে, তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং রিযিক অন্বেষণ কর।" (সূরা জুমা : ১০)

মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। মুচি জুতা সেলাই করেন, নাপিত চুল কাটেন, দর্জি কাপড় সেলাই করেন, ধোপা কাপড় পরিষ্কার করেন, জেলে মাছ ধরেন, ফেরিওয়ালা জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তাঁতী কাপড় বুনেন, কুমার পাতিল বানান, নৌকার মাঝি মানুষ পারাপার করেন। এসব কাজ এতই জরুরি যে, কাউকে না কাউকে অবশ্যই কাজগুলো করতে হবে। কেউ যদি এসব কাজ করতে এগিয়ে না আসতেন, তা হলে মানবজীবন অচল হয়ে পড়ত। কোনো কাজই নগণ্য নয় এবং যারা এসব কাজ করেন, তারাও হীন বা ঘৃণ্য নন।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে উত্তম ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন, "ফরজ ইবাদতের পর হালাল রুজি অর্জন করা একটি ফরজ ইবাদত।" (বায়হাকি) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেছেন, "তিনি তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিকদিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক থেকে আহার কর।" (সূরা মূলক : ১৫) আমাদের প্রিয় নবী (সা) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজ হাতে জুতা মেরামত করেছেন, কাপড়ে তালি লাগিয়েছেন, মাঠে মেষ চরিয়েছেন। নবীজী ব্যবসা পরিচালনাও করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা খনন করেছেন। বাড়িতে আগত মুসাফির কর্তৃক বিছানায় পায়খানা করে রেখে যাওয়া কাপড় ধৌত করে মানবতা ও শ্রমের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন, "শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।" (বায়হাকি) ইসলামী শরিয়াতে শ্রমিকের মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : 'এবং সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবে দাস-দাসীগণ' (সাঈদ আহমাদ, আর রিকক ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯৩)। ইসলামে দাস-দাসীদের মান ইজ্জতের অধিকার পূর্ণরূপে সংরক্ষিত। এটা এমন স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'জেনে রাখ, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেককেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।' (ইমাম বুখারি, আস-সহীহ) হযরত আলী (রা) শেষ বাণী ছিলো, 'সালাত এবং অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর।' (ইমাম আবু দাউদ, আস্ সুনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫) ইসলাম দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করার তাকিদ প্রদান করেছে। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম সকলকে জানিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : " তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।" (সূরা আন-নিসা : ৩৬) দাস-দাসীদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) শুধু তিরস্কার করেননি; বরং এমন আচরণের কারণে অনেককে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদি এক দাসীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলিয়ে দিয়েছিলো। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে তোমাকে এমন করেছে? অমুক ব্যক্তি? অমুক ব্যক্তি? যখন জনৈক ইয়াহুদির নাম বলা হলো, তখন সেই দাসী মাথার দ্বারা হ্যাঁসূচক ইশারা করল। অতঃপর ইয়াহুদিকে ধরে আনা হলো। সে তার অপরাধ স্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তার সম্পর্কে আদেশ জারি করলেন। এরপর দুই পাথরের মাঝখানে তার মাথা রেখে থেঁতলিয়া দেয়া হল। (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ (অনু.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৩) জাহিলি যুগে মনিবরা দাস-দাসীদেরকে মানুষ বলে গণ্য করতো না। খাদ্য, বস্ত্র তথা সকল পর্যায়ে তারা দাস-দাসীদের এবং নিজেদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রাখতো। তাদেরকে পেট ভরে খেতে দিতো না। নিজেরা সুন্দর পোশাক পরতো। আর অধীনস্থদেরকে হীন পোশাক দিতো। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ (সা) এই গর্হিত আচরণ রোধে ইসলামে দাস-দাসীদের অবস্থান এবং তাদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেশ করেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তা হলে সে যা খায় তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে তা হতে যেন পরিধান করতে দেয়। তাদেরকে সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য করবে না। যদি তোমরা তাদেরকে তাদের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ দাও, তাহলে তাদেরকে তোমরা সহযোগিতা করো।' (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬) হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'দাস-দাসীদের জন্য যথাযথভাবে খানা পিনা ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা মনিবের একান্ত কর্তব্য। এবং তার সাধ্যাতীত কোন কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না।' (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৫২)

দাস-দাসীরাও মানুষ। কাজের মধ্যে তাদেরও ভুল-ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জাহিলি যুগে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে দাস-দাসীদেরকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হতো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের অন্যায় ও ভুলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য জোর তাকিদ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসলেন। অতঃপর আরজ করলেন হে রাসূলুল্লাহ (সা)! দাস-দাসীদেরকে আমরা কতবার ক্ষমা করব? রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, দাস-দাসীদেরকে প্রত্যেক দিন সত্তরবার ক্ষমা করবে।' (সা'ঈদ আহমাদ, আর রিকক ফিল ইসলাম, পৃ. ১৮১)

রাসূলুল্লাহ (সা) দাস-দাসীদের প্রতি কেবল সদাচরণের আদেশ ও উপদেশ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি নিজেই তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন। তাদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন।

আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচার্যে দশ বছর ছিলেন। মহানবী (সা) ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো দশ বছর। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন : 'আমি মহানবী (সা)-এর খিদমতে দশ বছর কাটিয়েছি। তিনি আমার প্রতি কখনোও উহ্! শব্দ বলেননি। এই কথা জিজ্ঞাসা করেননি, তুমি এই কাজ কেন করলে অথবা কেন করলে না।' (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৯) ইমাম মুসলিম (রহ) এ সম্পর্কিত একটি হাদীস উদ্ধৃতি করেছেন তাঁর হাদীস গ্রন্থে। হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কোন গোলাম কিছু রান্না করে তার মনিবের কাছে

জাহিলি যুগে মনিবরা দাস-দাসীদেরকে মানুষ বলে গণ্য করতো না। খাদ্য, বস্ত্র তথা সকল পর্যায়ে তারা দাস-দাসীদের এবং নিজেদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রাখতো। তাদেরকে পেট ভরে খেতে দিতো না। নিজেরা সুন্দর পোশাক পরতো। আর অধীনস্থদেরকে হীন পোশাক দিতো। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ (সা) এই গর্হিত আচরণ রোধে ইসলামে দাস-দাসীদের অবস্থান এবং তাদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেশ করেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তা হলে সে যা খায় তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে তা হতে যেন পরিধান করতে দেয়। তাদেরকে সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য করবে না। যদি তোমরা তাদেরকে তাদের সাধ্যের বাইরে কোন কাজ দাও, তাহলে তাদেরকে তোমরা সহযোগিতা করো।' (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬)

নিয়ে আসে যার তাপ ও ধোঁয়া সে সহ্য করেছে, তখন তার উচিত হবে সেই গোলামকে কাছে বসিয়ে তা থেকে কিছু খাদ্য প্রদান করা। আর যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয়, তাহলে সে যেন তার হাতে এক গ্রাস অথবা দুই গ্রাস খাবার প্রদান করে।' (ইমাম মুসলিম, আস্-সহীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০)

প্রাক-ইসলামী যুগে দাস-দাসীদেরকে কথা-বার্তা, কাজ কর্মে এবং অবজ্ঞামূলক ভাষা প্রয়োগ করে হেয় করা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাস-দাসীদেরকে দাস-দাসী বলতে নিষেধজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার দাসকে আমার দাস না বলে। আর দাস-দাসীরা যেন মনিবকে আমার প্রতিপালক বা প্রতিপালক না বলে; বরং মানুষ তার দাসকে বলবে আমার সেবক বা সেবিকা এবং দাস-দাসীরা বলবে আমার সর্দার বা সর্দারণী। কেননা তোমরা সকলেই দাস এবং প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা।' (ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬)

মহানবী (সা) বলেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।" (বুখারী) শ্রমের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন, কারো জন্য স্বহস্তের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য আর নেই। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ) স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহ করতেন।'

মহানবী (সা) এ ব্যাপারে আরো বলেন, 'তোমরা শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।' অপরদিকে একজন শ্রমিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো- চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'আল্লাহ ঐ শ্রমিককে ভালবাসেন যে সুন্দরভাবে কার্য সমাধা করে।'

কিন্তু কোন কোন শ্রমিক মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করে থাকে, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এজন্য তাকে কিয়ামতের মাঠে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আর যদি শ্রমিক তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে, তাহ'লে তার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে বলেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো 'ঐ শ্রমিক যে নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং আল্লাহর হকও আদায় করে।' রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, 'সৎ শ্রমিকের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে।'

ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার :

শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ধর্ম ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে। শ্রমিকদের প্রতি সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম শ্রমের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে। মহান আল্লাহ বলছেন; তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর করুণাভাণ্ডার থেকে অন্বেষণ করো, আর আল্লাহ্কে প্রচুরভাবে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল কাম হবে। (সূরা জুমা : ১০) এই আয়াত হতে বুঝা যায় যে, ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ নামায শেষ করেই কাজের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছে। যে কোন ধরনের বৈধ কাজ উত্তম, মানুষের নিকট ভিক্ষা করা হতে। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ লাকড়ির বোঝা বহন করে বিক্রি করা উত্তম, কারো নিকট হাত পাতার চেয়ে, হয়ত সে দিতেও পারে আবার না করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম) শ্রমিককে তার প্রাপ্য পূর্ণভাবে যথাসময়ে প্রদান করাও মালিকের একটি প্রধান দায়িত্ব। অনেক সময় শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকগণ উপযুক্ত মজুরি না দিয়ে যৎ সামান্য মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চিত করে। এ ধরনের মালিকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তাদের মধ্যে একজন হলো, 'যে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করে অথচ তার পূর্ণ মজুরি প্রদান করে না'। (বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৪) হাদীস হাসান) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 'যেই সত্তার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ তার কসম যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হজ ও আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ব্যাপারগুলো না থাকত, তাহলে আমি শ্রমিক হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে পসন্দ করতাম।' (বুখারী হা/২৫৮৪; মুসলিম হা/৪৪১০)

শ্রমিকের পাওনা আদায় করা দোআ কবুলের কারণ

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে তারা রাত কাটাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল তোমাদের সৎ কার্যাবলীর ওসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারে না।

তখন তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ, আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়; কাজেই আমি তাদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহায়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। তাঁদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পছন্দ করিনি। তাই আমি তাঁদের জেগে ওঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের হতে দূর করে দাও। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে সঙ্গত হতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তারপর এক বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) এলো। আমি তাকে এক শ' বিশ দ্বিনার এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে একান্তে মিলিত হবে, তাতে সে রাজি হলো। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙার অনুমতি দিতে পারি না। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সঙ্গত হওয়া পাপ মনে করে তার কাছ থেকে ফিরে এলাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়ে আছি তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি (আরো একটু) সরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরিও দিয়েছিলাম, কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরির টাকা কাজে খাটিয়ে তা বাড়াতে লাগলাম। তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হলো। কিন্তু কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার মজুরি দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু-ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার মজুরি। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদ্রূপ করো না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদ্রূপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং নিয়ে চলে গেল। তা থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ, আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি সম্পূর্ণ সরে পড়ল। তারপর তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল। (বুখারী ও মুসলিম)

অনেক সময় মালিকগণ শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উপযুক্ত মজুরি না দিয়ে ইচ্ছামত মজুরি দেয়। মহানবী (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক দ্বারা কাজ করিয়ে শ্রমিকের পারিশ্রমিক পরিশোধ না করবে, কেয়ামত দিবসে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার বিরুদ্ধে বাদি হবেন।' (বুখারী শরীফ)

মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম সব মানুষের বিশেষ করে শ্রমিকদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং বস্তুগত কোন মানদণ্ড দিয়ে এ সম্মানের তুলনা চলে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সা) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শ্রমিকের হাতে চুমু খেতেন। তাবুকের যুদ্ধ শেষে রাসূলে খোদা যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন বিশিষ্ট সাহাবি সাদ আনসারি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। রাসূলুলাহ আনসারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার হাতের তালুতে কঠোর পরিশ্রমের ফলে সৃষ্ট খসখসে দাগ অনুভব করেন। তিনি বুঝতে পারেন, অধিক পরিশ্রমের ফলে সাদ আনসারির হাতের তালু ফেটে গেছে। তিনি আনসারির হাতে চুমু খেয়ে বললেন, 'এই হাতে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'

ইসলাম শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠতম বিশেষণে ভূষিত করেছে। এ ধর্ম সংসারের ভরণপোষণের জন্য হালাল উপায়ে উপার্জনকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সঙ্গে তুলনা করেছে এবং শ্রমিককে 'আল্লাহর পথের মুজাহিদ' বলে উল্লেখ করেছে। এ সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদেক (আ) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য আল্লাহর কাছে রিযিক কামনা করে, তাকে জিহাদের চেয়েও বড় পুরস্কার দেয়া হয়।' এ ছাড়া, যে ব্যক্তি হালাল রুজি উপার্জনরত অবস্থায় মারা যায়, তার পুরস্কার শহীদের সমান। পরিবারের ভরণ- পোষণের জন্য হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এ সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা) এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, 'যদি তোমার হাতে একটি চারাগাছ থাকে এবং তুমি জানো যে কিছুক্ষণ পর তুমি মারা যাবে কিংবা কিছুক্ষণ পর কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে, তারপরও তুমি সেটি রোপণ করে মারা যাও।'

ইমাম আলী (রা) এ সম্পর্কে বলেছেন: 'কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি জীবনে সফল হয়, বুদ্ধিমান অলস ব্যক্তি নয়।' হালাল রুজি উপার্জনকে জিহাদের সঙ্গে তুলনা করে পবিত্র কোরআনের সূরা মুযযাম্মিলের শেষ আয়াতে বলা হয়েছে: 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জন করার জন্য সফরে যাও এবং আল্লাহর কাছে রিজিক প্রার্থনা করো, আবার কেউ কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশ নাও।'

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ইমাম খোমেনী (রহ) বলেছেন: 'সমাজের সবচেয়ে দামি ও উপকারী শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক সমাজ। মানবসমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির চাকা ঘুরছে শ্রমিকদের হাতে। একটি টেকসই সমাজ সেখানকার শ্রমিকদের পরিশ্রমের কাছে ঋণী। পরিশেষে বলা যায়, এ বিশাল পৃথিবীর রূপ-লাবণ্যতায় শ্রমিকদের কৃতিত্বই অগ্রগণ্য। কিন্তু আক্ষেপ, সভ্যতার কারিগর এ শ্রেণীটি সর্বদাই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত। উদয়াস্ত উষ্ণ ঘামের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ নিয়ে খেটে যে শ্রমিক দেশের অর্থযন্ত্রটি সচল রাখে, কিন্তু শ্রমিকদের জীবনে সুখ-শান্তি জুটে না। এটাকে মৌমাছির সাথে তুলনা করা যায়, যারা দীর্ঘ পরিশ্রমের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করে চাকে সঞ্চয় করে, কিন্তু তার ভাগ্যে একফোঁটা মধুও জোটে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিকের বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর এ জন্য সর্বাগ্রে উচিত ইসলাম প্রদর্শিত মালিক-শ্রমিক নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।

লেখক : *কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন*

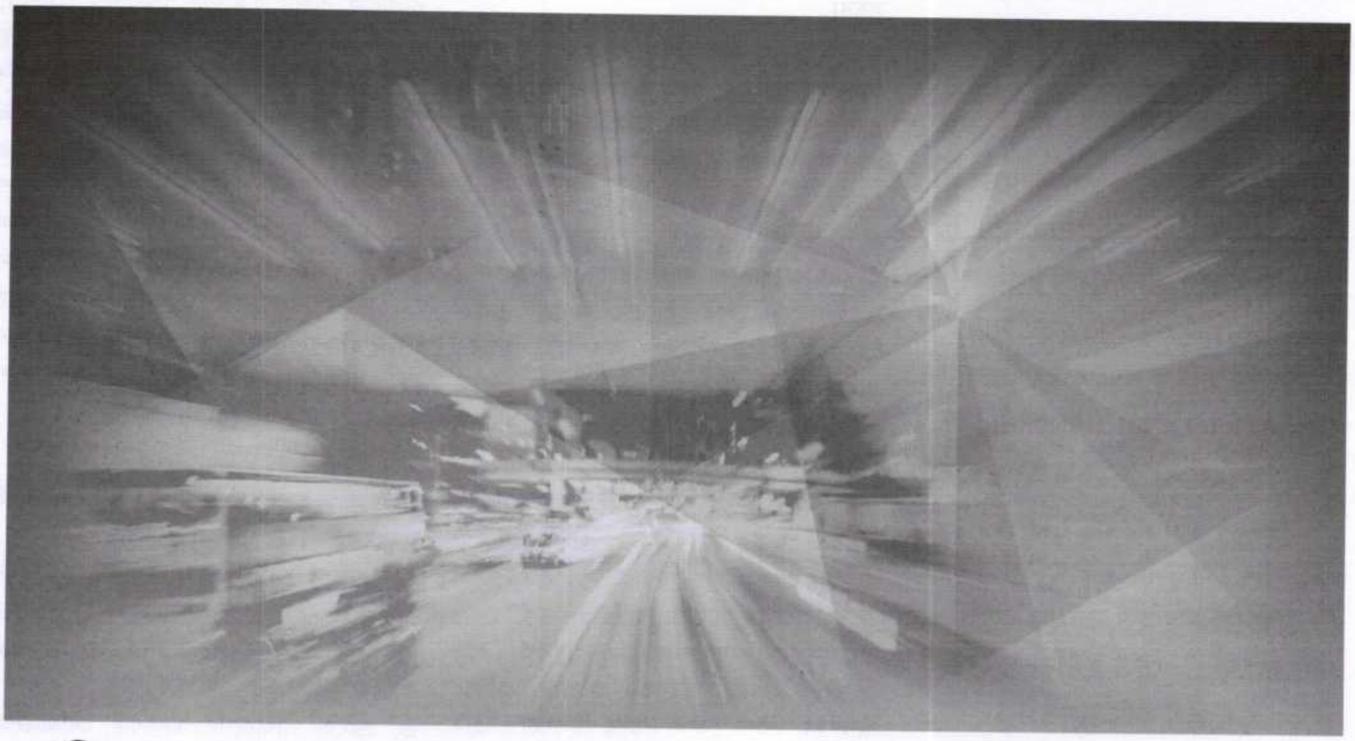

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পথ চলার ৫০ বছর

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

মহান আল্লাহর অগণিত শোকর আদায় করছি। যিনি মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, লালন পালন করছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন। মহা বিশ্বের সকল সৃষ্টি তার বিধান নিয়ম-কানুন মেনে চলছে। তাই সৃষ্টির মধ্যে নেই কোন অনিয়ম ও অনধিকার চর্চা। তাদের মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলা ও শান্তি। তেমনিভাবে মানবজাতিও যদি তারই বিধান মেনে চলে তাহলে থাকবে না ভেদা-ভেদ বিশৃঙ্খলা অনধিকার চর্চা। সবাই বসবাস করবে শান্তিতে, সবাই থাকবে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়া করে শ্রমজীবী মানুষের জন্য আল কুরআনে একটি শ্রমনীতি দান করেছেন। যার মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত দল মত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সমস্যার অদ্বিতীয় সুন্দর সমাধান রয়েছে।

৫০ বছর পূর্তির ইতিহাস লেখার জন্য আমাকে দায়িত্ব নিতে হলো তবে লেখার ব্যাপারে আমি খুবই অপরিপক্ক। আবার এ প্রবন্ধ লেখার জন্য কারো সাহায্য নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবো এমন সহকর্মী বেঁচে নেই, ২-১ জন বেঁচে থাকলেও কোন তথ্য দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমার স্মরণে যতটুকু আছে তা দিয়ে এ প্রবন্ধ লেখা শুরু করছি। প্রথমে আমি স্মরণ করছি এই ফেডারেশন গঠনে যারা প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছেন। ১. ব্যারিস্টার কুরবান আলী ২. ব্যারিস্টার আক্তারুদ্দিন ৩. ড. গোলাম সরোয়ার ৪. জনাব সাইয়্যেদ শহীদ শফিউল্লাহ (ফেনী) ৫. জনাব গোলাম মোস্তফা ৬. জনাব মাহবুবুর রহমান, আব্দুল ওয়াহেদ ও জনাব মফিজ উদ্দিন। আমি তাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করছি।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ

ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলার দুটি ধারায় শ্রমিক আন্দোলন চলছিল। তবে সমাজতন্ত্র ভারতসহ সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন গ্রাস করে নিয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষকে ধোঁকা দেয়া ও উত্তেজিত করার জন্য শ্রমিক ময়দানে স্লোগান ছেড়ে দিয়েছিল "দুনিয়ার মজদুর এক হও, শ্রমিক রাজ কায়েম কর" ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে স্কুল অব কমিউনিজম।

শ্রমজীবী মানুষ তাদের শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার হারিয়ে রাষ্ট্রীয় গোলামে পরিণত হলো। ব্যক্তি মালিকানায় সামান্য যে স্বাধীনতাটুকু ছিল, অধিকার আদায়ের সুযোগ ছিল, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এসে সেটুকু হারিয়ে ফেললো। ব্যক্তি মালিকানা মিল-কারখানায় মালিকের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দেশে সকল মিল-কারখানার মালিক রাষ্ট্র। তাই তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন করা মৃত্যু সমতুল্য। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ অসহায় শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। কারণ মানবরচিত আইন ভ্রান্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট। তাই সারা বিশ্ব যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষাক্ত ছোবলে দিশেহারা, ব্যক্তি মালিকানা খতম করে শ্রমিক রাজ কায়েম ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার চলছিল তখন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাদের বুদ্ধিজীবী ও আলেম ওলামাগণ সম্পূর্ণ নীরব ছিল, মনে হচ্ছিল শ্রমজীবী মানুষের জন্য ইসলামে কোন মুক্তির পথ নেই। তাই বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদীরাই শ্রমিক ময়দান একচেটিয়া দখল করে নিল।

ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলার দুটি ধারায় শ্রমিক আন্দোলন চলছিল। তবে সমাজতন্ত্র ভারতসহ সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন গ্রাস করে নিয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষকে ধোঁকা দেয়া ও উত্তেজিত করার জন্য শ্রমিক ময়দানে স্লোগান ছেড়ে দিয়েছিল "দুনিয়ার মজদুর এক হও, শ্রমিক রাজ কায়েম কর" ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে স্কুল অব কমিউনিজম। শ্রমজীবী মানুষ তাদের শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার হারিয়ে রাষ্ট্রীয় গোলামে পরিণত হলো। ব্যক্তি মালিকানায় সামান্য যে স্বাধীনতাটুকু ছিল, অধিকার আদায়ের সুযোগ ছিল, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এসে সেটুকু হারিয়ে ফেললো। ব্যক্তি মালিকানা মিল-কারখানায় মালিকের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দেশে সকল মিল-কারখানার মালিক রাষ্ট্র। তাই তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন করা মৃত্যু সমতুল্য। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ অসহায় শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি।

সূচনাঃ

এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে ইসলামী আন্দোলনের দুই জন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার কোরবান আলী ও ব্যারিস্টার আক্তার উদ্দিন শ্রমজীবী মানুষেকে ইসলামী আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সনে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সেবামূলক কাজ ও আইনি সহযোগিতা প্রদান করতে শুরু করেন। তাদের সেবামূলক কাজের সংবাদ শ্রমিক ময়দানে ছড়িয়ে পড়লো। আদমজী, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ, তেঁজগাও ও টঙ্গী শ্রমিক অঞ্চল থেকে হাজার হাজার শ্রমিক তাদের সমস্যা নিরসন ও আইনি সহায়তার জন্য দুই ব্যারিস্টারের কাছে ভিড় জমাতে আরম্ভ করে। ব্যারিস্টারদ্বয়ের সেবামূলক কাজ শ্রমজীবী মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এদেশে কোন ব্যারিস্টার ইতঃপূর্বে শ্রমজীবী মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ দিয়েছেন এবং তাদের সমস্যায় এগিয়ে আসছেন এমন কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। তাই দু'জন ব্যারিস্টারকে শ্রমজীবী মানুষের নেতা হিসাবে পেয়ে তারা খুব উৎসাহিত হয়েছেন এবং তারা মনে করছেন যে কোন সমস্যায় মালিকদের সাথে সার্থকভাবে ব্যারিস্টারদ্বয় মোকাবেলা করতে পারবেন।

শ্রমজীবী মানুষগণ তাদের নিঃস্বার্থ সেবা পেয়ে ব্যারিস্টারদ্বয়কে শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশন করার জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। ইতোমধ্যে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে মংলা বন্দরে শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়, উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। ব্যারিস্টার কুরবান আলী সাহেব কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে সমঝোতা করে দেন এবং শ্রমিকদের স্বার্থ হাছিল করতে সক্ষম হন। এতে ব্যারিস্টার সাহেবের নেতৃত্ব শ্রমজীবী মানুষদের মাঝে বেড়ে যায়। শ্রমিকদের আগ্রহ ও পরামর্শে ১৯৬৮ সালে ২৩ মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গঠিত হয়। যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ছিল জাতীয় ফেডারেশন-৩। যার প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন ব্যারিস্টার কুরবান আলী ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ড. গোলাম সরোয়ার (পূর্বপাক ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন)।

অফিসঃ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রথম অফিস ছিল ১৫ নম্বর নয়াপল্টন। প্রথম বৈঠকে যেসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন- মাওলানা এ কে এম ইউসুফ, মাস্টার শফিকুল্লাহ, ব্যারিস্টার আক্তার উদ্দিন, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, ড. গোলাম সরোয়ার, শহীদ সাইয়্যেদ শফিউল্লাহ (ফেনী), আব্দুল ওয়াহেদ (তেজগাঁও), মাহবুবুর রহমান-সেক্রেটারি আন্তর্জাতিক বাটা কোম্পানি (টঙ্গী), গোলাম মোস্তফা (ঢাকা) ও মফিজ উদ্দিন। উক্ত বৈঠকের স্থান ছিল সিদ্দিক বাজার কাউছার হাউজ। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৫৯ সালে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালে শিল্প সম্পর্ক বিধিমালার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের শ্রম দপ্তর থেকে ১৯৮০ সালের ১৫ মে দ্বিতীয়বার নিবন্ধন লাভ করে যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বাংলাদেশ জাতীয় ফেডারেশন (বা.জা.ফে-০৮)

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা।

২. আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথে ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

৩. শ্রমিক সাধারণের মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা এবং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা।

৪. শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, পারস্পরিক ঐক্য, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধের মনোভাব সৃষ্টি করা।

৫. শ্রমিকদের চাকরির অধিকার, মর্যাদা স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

৬. শ্রমিক সাধারণের জন্য আইনের সহযোগিতা সহজ লভ্য করা।

৭. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সুপারিশ ও কনভেনশন প্রয়োগ করার চেষ্টা করা।

৮. অনুমোদিত ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৯. শ্রমিকদের মধ্যে সমাজ, রাষ্ট্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির মনোভাব জাগ্রত করা।

১০. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১১. অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলির ধর্মঘট করার আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১২. পেশা উপযোগী ও নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১৩. ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ ও দৈনন্দিন জীবনের

মানোন্নয়নের চেষ্টা করা এবং প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ প্রদানের আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

প্রথমে যে সমস্ত ইউনিয়ন নিয়ে ফেডারেশন গঠিত হয় তা নিম্নে দেয়া হলো:

১. সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, টঙ্গী
২. কাদেরিয়া জুটমিল, টঙ্গী
৩. পেপার অ্যান্ড পালস, টঙ্গী
৪. গেকো ঔষুধ কোম্পানি তেজগাঁও
৫. দেসকো লেদার কোম্পানি টঙ্গী

দুই বছরের মধ্যে শ্রমিক কল্যাণের কাজ বিস্তার লাভ করে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেমন: ডেমরা, আদমজী, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী ও তেজগাঁও। প্রথম বছরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কয়েকটি শিল্পে সিবিএ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে রয়েছে ডেমরা লতিফ বাওয়ানী জুটমিল, টঙ্গী সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, কাদেরিয়া জুটমিল, তিব্বত ইন্ডাস্ট্রিজ ও বাটা জুতার কোম্পানি এবং এসব কারখানায় শ্রমিক কল্যাণের প্রতিনিধি নির্বাচনে বিজয় লাভ করে। ১৯৬৯ সালে ঢাকা মহানগরী রিকশা শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন গঠিত হয়। যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা শহর রিকশা শ্রমিক কল্যাণের পক্ষ থেকে রিকশা শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন ও দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। যে হরতালে ঢাকায় একটি রিকশাও চলেনি। যা পত্রপত্রিকায় হেড লাইন এসেছিল "জামায়াতে ইসলামীর প্রথম হরতাল"। রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন দৈনিক সংগ্রামের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব আব্দুস সাত্তার ও সেক্রেটারি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হারুনুর রশিদ খান।

টঙ্গীর শিল্প এলাকার নেতৃত্বে ছিলেন জনাব গোলাম মোস্তফা, জনাব মাহবুবুর রহমান যিনি আন্তর্জাতিক বাটা সু-কোম্পানির কয়েকবারের সিবিএ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পরও সেখানে শ্রমিক কল্যাণের পূর্ণ প্যানেলে বিজয় লাভ করে এবং জনাব মফিজ উদ্দিন বাংলাদেশ হওয়ার পরেও আশ্রাফ জুটমিলের সিবিএ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তেজগাঁও সরকারি বিজি প্রেসের সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুল ওয়াহেদ এবং ঢাকার বিখ্যাত কাওরান বাজারের কমিটির তিনি সভাপতি ছিলেন। তেজগাঁও কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানির সিবিএ এর সেক্রেটারি ছিলেন শহিদুল আলম। পাকিস্তানের সেরা জুট মিল আদমজীর কাজের সূচনা করেন জনাব আবুল কালাম আজাদ। পরবর্তী পর্যায়ে মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই যোগদান করেন। তিনি বদলি শ্রমিক হিসেবে আদমজী জুট মিলে কাজ করতেন। তখন আদমজীতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ৪০ টি ইউনিট ছিল।

ডেমরায় কাজের সূচনা করেন জনাব মেমিনুল হক এবং ডেমরায় লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে বাংলাদেশ হওয়ার পরেও পূর্ণ প্যানেলে বিজয় লাভ করে।

নারায়ণগঞ্জ ড্রেজারে কাজ আরম্ভ করেন জনাব নুরুল হক। পরবর্তীতে তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি হয়েছিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সুনাম, সুখ্যাতি ও সেবামূলক কাজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রভাব শ্রমিকদের মধ্যে অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যারিস্টার কুরবান আলী ও ড. গোলাম সরোয়ার বিদেশে চলে যান। ১৯৭৩ সনে অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মনোনীত হন এবং অধ্যাপক হারুনুর রশিদ সেক্রেটারি মনোনীত হন। সারাদেশে জেলা ও থানা পর্যায়ে শ্রমিক কল্যাণের কাজ সুসংগঠিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ শুরু করা হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পরেও উক্ত শিল্প কারখানায় আমাদের কাজ অব্যাহত ছিল এবং আমরা সিবিএ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বিজয় লাভ করি।

১৯৭৩ সন থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে সারাদেশে বিশেষ করে জেলা ভিত্তিক ও মহকুমা ভিত্তিক সংগঠন কায়েমের চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয় জনাব এম এ তাহের ভাইকে আর খুলনায় জনাব মোল্লা হারুনুর রশিদ, রাজশাহীতে জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং ঢাকা বিভাগে জনাব হারুনুর রশিদ খান।

শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলনের কাজ এগিয়ে চলে। শ্রমিক ময়দানে নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র বাদিদের আন্দোলনের ভিত নড়ে যায়। শ্রমজীবী মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে ইসলামী শ্রমনীতির মাধ্যমে তাদের সকল সমস্যার সমাধান ও নিশ্চিত মুক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে তারা ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থা দেশে ফিরে আসলে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক ময়দানে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

বর্তমানে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সদস্য সংখ্যা ১৭৫০, কর্মী ২৩২৯৮, সাধারণ সমর্থক ৩৫৩৭৮৮, ইউনিট সংখ্যা ৩৪৩৪, লাইব্রেরি ১২৪১, বই সংখ্যা ৭০২০৫, ট্রেড ইউনিয়ন সংখ্যা ২১০। ফেডারেশনের শাহাদাত বরণকারী কর্মীর সংখ্যা ২১,

১৯৭১ সনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রথম শহীদ ফেনীর সাইয়্যেদ শফিউল্লাহ।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দু'টি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে আন্দোলন করেছিল একটি হচ্ছে লেবার কোর্ট ৯৪, যার মাধ্যমে শ্রমিক ঐক্য গঠন করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে। এ উপলক্ষে সারাদেশব্যাপী নেতৃবৃন্দের সফর হয়েছে। বর্তমানে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চেষ্টায় শ্রমিক ঐক্য গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৬টি ফেডারেশন অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত ফেডারেশনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকদের সমস্যা ও স্বার্থ আদায় করার জন্য আন্দোলন রয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাথে ১১টি জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়ন আছে

১. বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ-সদস্য সংখ্যা-২০০০০ হাজার, আমেরিকার সিআইএ জাতীয় ভিত্তিক ইউনিয়ন গঠন করে। পাকিস্তানের সময় এ ইউনিয়নের সকল কমিটির সদস্যবৃন্দ ইউনিয়নসহ শ্রমিক কল্যাণে যোগদান করে।
২. বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়ন
৩. চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন
৪. ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন
৫. জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৬. বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
৭. ব্যক্তিমালিকানাধীন স্টিল রি- রোলিং শ্রমিক ইউনিয়ন
৮. বাংলাদেশ স্থলবন্দর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৯. ইউসিবিএল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন
১০. ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ফেডারেশন
১১. বাংলাদেশ টিএনটি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
১২. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে Industrial

কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারিবৃন্দ		
কার্যকাল	সভাপতি	সেক্রেটারি
১৯৬৮-১৯৭২	মরহুম ব্যারিস্টার কুরবান আলী	ড. গোলাম সরওয়ার
১৯৭৩-১৯৭৮	অ্যাড. এ বি এম আনোয়ার হোসেন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
১৯৭৯-১৯৮০	অ্যাড. এবি এম আনোয়ার হোসেন	অ্যাড. শেখ আনছার আলী
১৯৮১-১৯৮২	মরহুম মোঃ নুরুল হক	অ্যাড. হাতেম আলী তালুকদার
১৯৮২-১৯৮৫	মরহুম মোঃ নুরুল হক	মরহুম শাহ আলম চৌধুরী
১৯৮৫-১৯৮৬	মরহুম মোঃ নুরুল হক	এম. এ. গণি
১৯৮৭-১৯৮৯	মরহুম মাষ্টার শফীকউল্লাহ (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
১৯৯০-২০০১	অ্যাড. শেখ আনছার আলী (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
২০০২-২০০৩	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
২০০৪-২০০৮	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২০০৯-২০১৬	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
২০১৭-২০১৮	অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার (সাবেক এমপি)	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

Relation Institute (IRI) এর (শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন) ট্রেনিং গ্রহণ করেছে এবং শ্রমিক কল্যাণ অফিসেও তাদের প্রশিক্ষণ কোর্স কয়েক বছর চলছিল। কেন্দ্র, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ফেডারেশনের শিক্ষা শিবির ৫-৭ দিনব্যাপী চলতো। যার মাধ্যমে শ্রমিক আইন ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

শিক্ষা শিবির:

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তার কর্মী ও সমর্থকদেরকে নৈতিক ও শ্রম আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ৫-৭ দিনব্যাপী শিক্ষা শিবির করা হতো এখনও চলছে। এসব শিক্ষা শিবিরে ৫০ থেকে ৩০০ শত শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকতো। এখানে শিক্ষক হিসাবে আইআরআই শিক্ষকবৃন্দ অতিথি হিসাবে থাকতেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতেন অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা একেএম ইউসুফ, শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, শহীদ কামারুজ্জামান, শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা।

First Labor Court **(প্রথম শ্রম আদালত):** শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি হারুনুর রশিদ খান দশ বছর ধরে প্রথম শ্রম আদালতের সদস্য ছিলেন, প্রায় ২৫০ দিন বিচার এজলাসে উপস্থিত থেকে শ্রমজীবী মানুষের মামলায় ন্যায়বিচার লাভের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

International Labour organization (ILO) আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা জাতিসংঘের একটি অঙ্গসংগঠন। যারা সারা দুনিয়ার মালিক শ্রমিকদের সমস্যা দেখেন এবং সমন্বয় করেন। এদের সদস্য হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কাজের তৎপরতা জানার জন্য আমাদেরকে পত্র দিতেন ১৯৭৯ সনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন আইএলও **(ILO)** এর সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

International Islamic confederation of labour (IICL) (ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মিসরের জামালুল বান্না আর সহসভাপতি হয়েছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব অ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং অধ্যাপক মজিবুর রহমান ও সেক্রেটারি ছিলেন সিরিয়ার সাইয়্যেদ আল হাসান। তাদের কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়েছিল এবং বাংলাদেশ তাতে অংশগ্রহণ করে এ মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শ্রমনীতির ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর কেন্দ্রীয় অফিস জেনেভায়। এ সংগঠন আইএলও কর্তৃক স্বীকৃত।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ৩টি দেশে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন চলছে।
১. তুরস্ক ২. পাকিস্তান ৩. বাংলাদেশ

International Islamic confederation of labour (IICL) (ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মিসরের জামালুল বান্না আর সহসভাপতি হয়েছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব অ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং অধ্যাপক মজিবুর রহমান ও সেক্রেটারি ছিলেন সিরিয়ার সাইয়্যেদ আল হাসান। তাদের কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়েছিল এবং বাংলাদেশ তাতে অংশগ্রহণ করে এ মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শ্রমনীতির ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর কেন্দ্রীয় অফিস জেনেভায়। এ সংগঠন আইএলও কর্তৃক স্বীকৃত।

আন্তর্জাতিক সেমিনার :

পাকিস্তান National labur Federation এর উদ্যোগে ১৯৯৩ সনের এপ্রিল মাসে ইসলামিক মডেল অব মুভমেন্ট নামের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় ত্রিপক্ষীয় প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ: শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় এবং আইএলও এর যৌথ উদ্যোগে Development Of Sound labur Relations and Mutual Under-standing এই বিষয়ের ওপর ১৯৯৩ সালে আয়োজিত ত্রিপক্ষীয় প্রশিক্ষণ কোর্সে-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং তৎকালীন খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া গোলাম পরওয়ার শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

আই.আই.সি.এল. এর সম্মেলনে অংশ গ্রহণ:
১৯৯৯ সনের ১০-১১ জুন জেনেভায় International Islamic Confederation Of Labour (IICL) এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনে শহীদ হাসানুল বান্নার ছোট ভাই জামালুল বান্না আইআইসিলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মরক্কোর সাইয়্যেদ আল হাসান সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহসভাপতি নির্বাচিত হন। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান উক্ত সংগঠনের সম্মেলন উপলক্ষে পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও মরক্কো সফর করেন।

এপিও এনপিও জেপিসিএসইউডি আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠক অংশগ্রহণ:
ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে এবং এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) ও জাপান প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার ফর সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (জেপিসিএসইডি) এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের মতিঝিলস্থ কনফারেন্স রুমে আয়োজিত ২ দিনব্যাপী গোলটেবিল বৈঠকে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ জাপান, ইন্ডিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিবার্ষিক সম্মেলন:
শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতি ২ বছর পরপর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন করে আসছে। বাংলাদেশ হওয়ার পরেও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মতিঝিল সরকারি হাইস্কুল মাঠে ৩ বার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন করেছিল। সেখানে সারাদেশ থেকে ৩ থেকে ৫ হাজার ডেলিগেট হিসাবে উপস্থিত ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ৪ বার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল। এ ছাড়া মাহবুব আলী মিলনায়তনে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে, প্রেসক্লাব, বায়তুল মোকাররম মিলনায়তন, জাতীয় ক্রীড়া মাঠে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। এসব সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম, শহীদ মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, শহীদ কামারুজ্জামন, শহীদ আবদুল কাদের মোল্লা, বিচারপতি বাকের ও বিচারপ্রতি আবদুর রউফ। এসব সম্মেলনে বিদেশী মেহমানও আমন্ত্রণ করা হতো। তুরস্কের লেবার ফেডারেশন হাকিস এর সহসভাপতি জনাব হোসাইন তানরী বাদরী ও পাকিস্তানের ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশনের সভাপতি আবদুল মালেক উপস্থিত ছিলেন।

রাজপথে মিছিল ও র‍্যালি:
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন দিবস বিশেষ করে দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে রাজপথে বড় বড় মিছিল ও র‍্যালি রেব করা হতো।

মে দিবস:
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মে দিবসকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে উদযাপন করে আসছে। এ উপলক্ষে রাজপথে মিছিল ও বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা ও সেমিনার করা হতো।

অফিস পরিদর্শন:
১৯৯১ সালে মুহতারাম ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব-বাংলাদেশের সাবেক সৌদি রাষ্ট্রদূত, জনাব আতাউল্লাহ, কর্মকর্তা-ইসলামিক রিলিফ ইউকে এবং মিসেস ক্যাট ফিলিপস-কমনওয়েলথের সাবেক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং প্রেসিডেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল, (টক) ইউকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিজিট করেন। এ সময় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মেহমানবৃন্দকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এবং ফেডারেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিতভাবে বিভিন্ন তথ্যাদি দেয়া হয়।

জাতীয়ভিত্তিক আন্দোলন :
লেবার কোড-৯৪ ঢাকায় অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং বিআরইএলের মির্জা মিজানুর রহমান অন্যতম সমন্বয়কারী এবং চট্টগ্রামে ফেডারেশনের বিআরইএল নেতা মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, প্রধান সমন্বয়কারী হিসাবে লেবার কোড-৯৪ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সালে লেবার কোড ৯৪ সংশোধনের উদ্দেশ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সুপারিশমালা শ্রম মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আলমগীর মজুমদার।

পাকিস্তান National labur Federation এর উদ্যোগে ১৯৯৩ সনের এপ্রিল মাসে ইসলামিক মডেল অব মুভমেন্ট নামের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী অংশগ্রহণ করেন। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় এবং আইএলও এর যৌথ উদ্যোগে Development Of Sound labur Relations and Mutual Understanding এই বিষয়ের ওপর ১৯৯৩ সালে আয়োজিত ত্রিপক্ষীয় প্রশিক্ষণ কোর্সে-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং তৎকালীন খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিয়া গোলাম পরওয়ার শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

Tripartite consultative committee (TCC) ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (মালিক, শ্রমিক ও সরকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি):

যার মাধ্যমে শ্রমিকদের সকল সমস্যা সমাধান কল্পে আইন তৈরির পরামর্শ দেয়া হয়। ১৯৯২ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট শেষ আনছার আলী এবং ২০০২ সাল থেকে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, (শ্রমিক, মালিক ও সরকার) এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কমিটি মালিক ও শ্রমিকদের সমঝোতা সৃষ্টি ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হাছিল করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শ্রম আদালত:

শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধের মীমাংসা করে থাকে শ্রম আদালত। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে প্রথম শ্রম আদালতে শ্রমিক পক্ষের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট ৬৯টি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে অসহায় শ্রমিকদের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে শ্রমিকদের সমস্যা, মলিক-শ্রমিকের সমন্বয় ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে শ্রমিক কল্যাণের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ : ২০০২ সালের ২৮ মে কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

শিল্পমন্ত্রী এমকে আনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ : ২০০২ সালের ১৮ জুন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ শিল্পমন্ত্রী এমকে আনোয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করে ১১ দফা সুপারিশমালা পেশ করেন।

যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সাথে সাক্ষাৎ: ২০০২ সালের ১৮ জুন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

শ্রমিক দল সভাপতি ও খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমানের সাথে সাক্ষাৎ : ২০০২ সালের ১৪ জুলাই ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির নেতৃত্বে শ্রমিক দল সভাপতি ও খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান এর সাথে মতবিনিময় সভা করে আদমজী জুট মিলের শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা, বিরাজমান শ্রম সমস্যা, ন্যায় সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায়ে যৌথ প্রচেষ্টা, ৪ দলীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি তুলে ধরেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ : ২০০২ সলের মে মাসে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বাংলাদেশসহ পাকিস্তান রাষ্ট্র দূতের সাথে সাক্ষাৎ করে ফেডারেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেন।

২০০২ সালে আদমজী জুট মিল বন্ধের সিদ্ধান্তে ফেডারেশনের তীব্র নিন্দা: এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুটমিল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেডারেশন তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং মিলবন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। এ সময় আদমজী শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনাদি পরিশোধের জন্য বিভিন্ন দাবি- জানিয়ে ২০০০০ লিফলেট ছাপিয়ে ফেডারেশনের পক্ষে বিতরণ করা হয়।

এ ছাড়া ২০০২ সালে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ ৯ জুলাই দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক বাহাউদ্দিন, ১১ জুলাই ২০০২ বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান, ২৪ জুলাই ২০০২ দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট সম্পাদক মাহবুব আলম এবং ২৮ জুলাই দৈনিক দিনকাল ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কাজী সিরাজ উদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করে শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের লিখনি তুলে ধরার আহবান জানান।

বিটিএমসি এবং বিসিআইসিসি চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ:

২০০২ সালের ৩০ অক্টোবর ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বিটিএমসি এবং বিসিআইসি চেয়ারম্যানদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে বিটিএমসির আন্ডারে পরিচালিত বন্ধকৃত মিল কারখানা এবং বিসিআইসি পারিচালিত বন্ধকৃত বিভিন্ন কাগজকল, ম্যাচ এবং ব্যাটারি ফ্যাক্টরি চালু করার জোর দাবি জানান।

আইএলও পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ: ২০০২ সালের ২৮ শে অক্টোবর ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আইএলও বাংলাদেশস্থ পরিচালক জনাব গোপাল ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করে ফেডারেশনের কার্যক্রম ও শ্রম সেক্টরে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি National Co-ordination Councel for workers education (NCCWE) এই সংগঠনের মাধ্যমে আইএলও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন বামপন্থী হওয়ার কারণে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে উক্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আইএলও এর প্রতিনিধিকে হিসাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইএলও ডাইরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের গুরুত্ব:

শ্রমিক আন্দোলন যে কোন দেশে পরিবর্তনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই সূচনাতেই মূল সংগঠন ২ জন ব্যারিস্টার দ্বারা এ কাজ শুরু করেন। ১৯৭০ সনে ঢাকা রিকশা কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে পূর্ণ হরতাল সফল হয়। সে সময় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মরহুম আব্দুল খালেক সাহেব আমাকে অফিসে ডেকে নিয়েছিলেন এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন একটি রিকশাও রাস্তায় চলতে দেখি নাই। এ হরতাল কারা ডাকলো আমি জবাবে বলেছিলাম আমরাই এই হরতাল ডেকেছিলাম এবং আল্লাহর রহমতে সফল হয়েছি। তিনি খুশি হয়ে আমাকে সংগঠনের জন্য ৫ হাজার টাকা উপহার দিয়েছিলেন। মরহুম আব্বাস আলী খান আমাকে একদিন কেন্দ্রীয় অফিসে ডেকে নিয়ে যান এবং আমাকে বললেন তোমাদের শ্রমিক আন্দোলন কি রকমের চলছে। আমি জবাবে বললাম আল্লাহর রহমতে ভালোই চলছে। তিনি তখন ভারপ্রাপ্ত আমির। তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন আমি যখন উত্তরবঙ্গে যাই এবং আরিচা ঘাটে গাড়ি নিয়ে পৌঁছি তখনও কোন ড্রাইভার এসে আমার সাথে দেখা করে না। তাতে বুঝি তোমাদের আন্দোলন খুবই দুর্বল অর্থাৎ তার সাথে সংগঠনের অনেকে দেখা সাক্ষাৎ করেন তাকে সংবর্ধনা দেন। কিন্তু তাতে তার মনের প্রশান্তি

আসে না। কারণ তিনি মনে করতেন শ্রমিক আন্দোলন জোরদার না হলে আসলে কোন দেশের আন্দোলনই সফল হয় না। তাই তিনি বলিষ্ঠ শ্রমিক আন্দোলন না দেখে তার মনে কষ্ট লেগেছিল। আল্লাহ আমাদেরকে তার সেই মনের কষ্ট পূরণ করার তৌফিক দান করুন। আমি যখন সৌদি এয়ারলাইন্সে চাকরি করি এবং আমার সহধর্মিণী সৌদি একটি কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন তখন মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বললেন শ্রমিক আন্দোলনে লোকের অভাব। তোমার দেশে আসা খুবই প্রয়োজন। আমি তার নির্দেশে দেশে চলে আসি। বর্তমানে শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব অনুভব করে মূল সংগঠন নায়েবে আমিরকে সভাপতি হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করছে।

সাংগঠনিক স্তর:

বাংলাদেশ হওয়ার পর বিভাগ ছিল ৪টি ১. ঢাকা ২. চট্টগ্রাম ৩. রাজশাহী ৪. খুলনা। বর্তমানে নতুন বিভাগ হয়েছে সিলেট, রংপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সর্বমোট ৮টি বিভাগ রয়েছে এবং প্রত্যেক বিভাগে সভাপতি সেক্রেটারিসহ বিভাগীয় কমিটি রয়েছে এবং ১১টি মহানগরী রয়েছে, প্রতিটি মহানগরীকে সাংগঠনিক বিভাগ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং মহানগরী সভাপতি বিভাগীয় সভাপতির মর্যাদা লাভ করে থাকে। বাংলাদেশ হওয়ার পর জেলা ছিল ১৭টি বর্তমানে ৭৮টি জেলা রয়েছে এবং প্রত্যেক জেলায় জেলা কমিটি রয়েছে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আয়ের উৎস

১. শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলোর চাঁদা।

২. শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সদস্যদের মাসিক চাঁদা।

৩.শুভাকাঙ্ক্ষীদের দান।

৪. যাকাত সংগ্রহ

৫. প্রকাশনার আয়

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেবামূলক কাজ:

১. শ্রমিকদেরকে আইনি সহায়তা দান।

২. চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালের চেষ্টা।

৩. বেকার শ্রমিকদের চাকরির ব্যবস্থা করা।

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার শ্রমিকদের চাকরির জন্য সক্ষম করে তোলা।

৫. অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যাপারে সহযোগিতা

৬. শ্রমিকদের সন্তানদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করা।

৭. শ্রমিকদেরকে বিনামূল্যে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা।

৮. বস্তিতে শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের বিনামূল্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা।

৯. শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা।

১০. অসহায় শ্রমিকদের দাফন-কাফনে সহযোগিতা করা।

১১. বন্যা দুর্ঘটনা এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে রিলিফ বিতরণ করা।

১২. দুই ঈদে শ্রমিকদের মধ্যে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নিজস্ব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

১. পরিচিতি ২. গঠনতন্ত্র ৩. শ্রমিকের অধিকার ৪. ইসলামী শ্রমনীতি ৫. রাসূল (সা:) এর ঐতিহাসিক ভাষণ ৬. শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ ৭. ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি ৮. ইসলামী সমাজে শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ৯. আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক ও শিল্প ১০. তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন ১১. ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য ১২. ট্রেড ইউনিয়নের প্রাথমিক গাইড ১৩. ইসলামী শ্রমনীতির সুফল।

একনজরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অর্জন

১. শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ইসলামী জীবনব্যবস্থার চেতনা জাগ্রত করে।

২. বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী শ্রমনীতির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়নের সূচনা করে।

৩. ইসলামের পতাকাবাহী একমাত্র সরকারের রেজিস্ট্রিকৃত ফেডারেশন যার রেজি নং বা.জা.ফে-০৮

৪. কুরআন হাদীসের আলোকে শ্রমিকদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা

৫. লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের নিকট ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত পৌছানো হয়েছে

৬. শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সকল শ্রমজীবী মানুষের নিকট পরিচিত একটি সংগঠন

৭. শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মালিক -শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নয় সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে

৮. আইএলও এর সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ

৯. টিসিসির সদস্য পদ লাভ

১০. প্রথম লেবার কোর্টে সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ

১১. ইসলামী শ্রমনীতির আন্তর্জাতিক বলয় সৃষ্টিতে অবদান

১২. ২১০টি রেজিস্টারড ট্রেড ইউনিয়ন লাভ

১৩. জাতীয়ভাবে শ্রমিক ময়দানে শ্রমিক কল্যাণে স্থান চতুর্থ

১৪. প্রত্যেক থানায় ও উপজেলায় শ্রমিক কল্যাণের শাখা গঠন

১৫. শ্রমিক ময়দানে ইসলামের জন্য শাহাদাতের নজরানা পেশকারী সংগঠন

১৬. হাজার হাজার শ্রমিককে শ্রম আইন ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

১৭. হাজার হাজার শ্রমিককে কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে

১৮. শ্রমিকদেরকে কাজে ফাঁকি না দেয়া নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে

১৯. মালিকের কাজকে আমানত হিসাবে আদায় করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

২০. মালিক পক্ষ শ্রমিকের অধিকার আদায় না করা দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে

লেখক : *কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক*
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

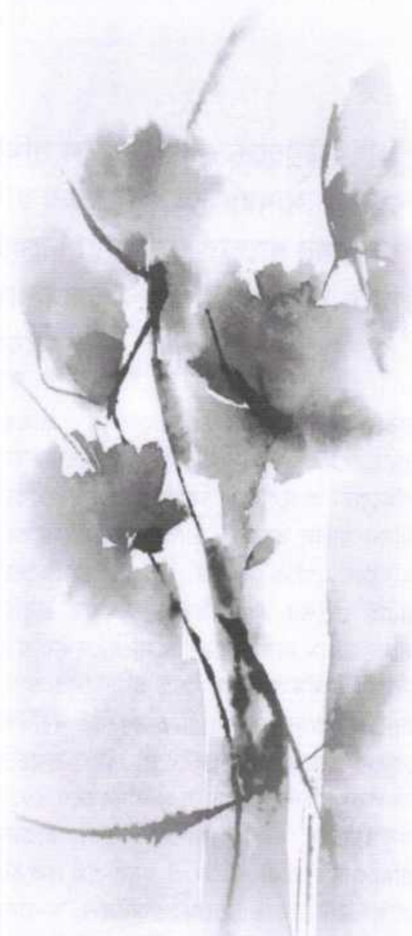

সমস্যার আবর্তে চাতাল শ্রমিক

গোলাম রব্বানী

কৃষির উন্নয়নের সাথে চাতাল শ্রমিকেরা জড়িত। আমাদের দেশে ভাতই হচ্ছে জনগণের প্রধান খাদ্য। আর চাল থেকেই আমরা ভাত পাই। এই চাল প্রস্তুত করতে যারা দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন তারাই চাতাল শ্রমিক। মানুষের খাদ্যের জন্য যারা নিয়োজিত তাদের কেউ খোঁজখবর রাখে না এর চাইতে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে। মিল-ফ্যাক্টরি কল-কারখানায় শ্রমিকেরা অধিকার আদায় করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া বা ট্রেড ইউনিয়ন করার যে সুযোগ পায় চাতাল শ্রমিকেরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত।

চাতাল শ্রমিকেরা বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজেরই একটি অংশ। সামগ্রিকভাবে শ্রমিকেরা অবহেলিত নির্যাতিত ও মানবেতর জীবন যাপন করেন। তারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ শ্রমিকদের দ্বারাই দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরে প্রবৃদ্ধি বাড়ে, মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে দেখার স্বপ্ন দেখে। নির্মম পরিহাস সেই শ্রমিকদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সরকার বা তথাকথিত দরদিরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। মিল-ফ্যাক্টরি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের চেয়ে নিকৃষ্টমানের জীবন যাপন করেন চাতাল শ্রমিকেরা। তারা শ্রমিক এ খবর শ্রম দফতর রাখে কিনা তাও সন্দেহ আছে। অন্যান্য শ্রমিকেরা মিছিল মিটিং, সমাবেশ করে তাদের সমস্যাগুলো বলার সুযোগ পায় কিন্তু চাতাল শ্রমিকদের ভাগ্যে তাও জোটে না।

বাংলাদেশ শিল্পপ্রধান দেশ নয় বরং কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের জনগণ কৃষির সাথে জড়িত। কৃষির ওপর অর্থনীতি নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ বাংলাদেশে দুটো সম্পদ দিয়েছেন একটি হলো মানবসম্পদ আর একটি হলো মাটিসম্পদ। বাংলাদেশে মাটির উর্বরাশক্তি থাইল্যান্ড ও জাপানের চেয়ে ৪/৫ গুণ বেশি। তারা কৃষির ওপর তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমধর্মী কোন তৎপরতা চোখে পড়ার মতো নয়। দেশের অর্থনীতির জন্য যেমন শিল্পের উন্নয়নের প্রয়োজন তেমনি কৃষির উন্নয়ন আরও প্রয়োজন। কৃষির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া জরুরি। শহরের সচ্ছলতা চোখধাঁধানো বাড়ি, দামি দামি গাড়ি, পিচঢালা পথ আর দামি-দামি শপিং মলই দেশের উন্নয়নের প্রতীক নয়।

কৃষির উন্নয়নের সাথে চাতাল শ্রমিকেরা জড়িত। আমাদের দেশে ভাতই হচ্ছে জনগণের প্রধান খাদ্য। আর চাল থেকেই আমরা ভাত পাই। এই চাল প্রস্তুত করতে যারা দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন তারাই চাতাল শ্রমিক। মানুষের খাদ্যের জন্য যারা নিয়োজিত তাদের কেউ খোঁজখবর রাখে না এর চাইতে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে। মিল-ফ্যাক্টরি কল-কারখানায় শ্রমিকেরা অধিকার আদায় করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া বা

ট্রেড ইউনিয়ন করার যে সুযোগ পায় চাতাল শ্রমিকেরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। চুক্তিভিত্তিক কাজ করানো হয় বলে তারা শ্রমিক নয়। চাতাল শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত একটি শিল্প কিন্তু শ্রম আইনের একটি ধারাও মানা হয় না।

সরকারি নজরদারির অভাবে তারা শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি পায় না। চাতালে রোদ্রে পুড়ে আগুনের তাপে ধূলিময়লার মধ্যে সারাক্ষণ অমানুষিক কাজ করে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি না পাওয়া অকল্পনীয়। বেসরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে ৪০ হাজারের বেশি চাতাল আর প্রায় ৬ লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করেন। চাতাল শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগই নারীশ্রমিক। কম মজুরিতে বেশি কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব হয় বলে মালিকেরা নারীশ্রমিকদের বেশি কাজে লাগায়। নারীরা সাধারণত মালিকদের সাথে প্রতিবাদ করে না যা হুকুম দেয় নারীর স্বভাবগত কারণে তা পালন করে। আবার নারীশ্রমিকেরা কাজ ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা রাখে না। পুরুষ শ্রমিকেরা নানা অজুহাতে নানাভাবে মালিকদের কাজ না করেই মজুরি আদায় করতে সক্ষম হয়। নারীর কাজ বেশি করতে হয় কিন্তু মজুরি কম পায়। নিয়ম অনুযায়ী ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করবে না। বেশি করলেও ওভার টাইম বা বোনাস দিতে হবে। কিন্তু চাতাল মালিকেরা অতিরিক্ত শ্রমের জন্য কোন অতিরিক্ত মজুরি দেয় না।

চাতাল মালিকেরা শ্রমিকদের কোন নিয়োগপত্র দেয় না। ফলে চাকরির কোন নিরাপত্তা থাকে না। মালিক ইচ্ছা করলেই কোন কারণ ছাড়াই যে কোন শ্রমিককে যখন তখন চাকরি থেকে বাদ দিতে পারে। পেটের ক্ষুধার জ্বালায় যারা ছটফট করে তারা নিয়োগপত্রের আশা না করে চুক্তিতেই কাজ করতে বাধ্য হয়। শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা সাধারণত চাতালের নিয়ম কানুন বিধিবিধান পালন করা হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করে না। আর পরিদর্শন করলেও চাতাল কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাদের খুশি করে ভালো রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

নারীশ্রমিকদের জন্য মালিকেরা কাজের পরিবেশ করে দেয় না, নারীদের জন্য আলাদা কোন টয়লেট নেই, বিশ্রামের জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই। এমনটি যে সমস্ত নারী শ্রমিকেরা তাদের ছোট শিশুদের নিয়ে যায় তাদের রাখার কোন জায়গা পায় না। শিশুকে কোলে নিয়েই রোদ্রে পুড়ে কাজ করতে হয়।

কাজের পরিবেশ না থাকা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকেরা অল্প বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ও কর্মদক্ষতা হারায়। ধূলিময়লার মধ্যে কাজ করার কারণে ফুসফুস দুর্বল হয়ে যায়। ফলে অ্যাজমা জাতীয় মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

চাতাল শ্রমিকদের জন্য মালিকদের পক্ষ থেকে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। কোন চাতাল শ্রমিক মারা গেলেও তার পরিবারের জন্য মানবিক দিক থেকেও কোন প্রকার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না। আবার শ্রমিক যদি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয় তার চিকিৎসা এমনকি চাতালে কাজ করতে করতে যদি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় সেখানেও মালিক নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

নারীশ্রমিকদের মাতৃকালীন ছুটি থাকে না, মাতৃত্বকালীন কোন ভাতা পায় না। "কাজ করলে মজুরি না করলে কিছুই না" এ নীতিতে শ্রমিকেরা চলতে বাধ্য হয়।

এ কেমন সভ্যতা এ কেমন মানবতা। ভাবতেই কষ্ট হয়, শিশু যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন বেশি বেকায়দায় পড়ে আবার কাজ কম হলে মালিকদের গালমন্দ খেতে হয়।

২০০৬ সালের শ্রম আইনে ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করার যেমন বিধান নেই তেমনি রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কাজ করা নিষেধ আছে। কিন্তু চাতাল মালিকেরা নিজের প্রয়োজনে এসব বিধানের কোনো তোয়াক্কা করে না। শ্রমিকদের জন্য সরকার যে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এ নগণ্য মজুরি চাতাল শ্রমিকদের জন্য মালিকেরা নির্ধারণ করেনি। সাধারণত একজন পুরুষ শ্রমিক ২০০ ও একজন নারীশ্রমিক একদিন কাজ করে ১৬০ টাকা পায়। চাতাল মালিকেরা যে বেতন দেয় তাতেই কাজ করতে বাধ্য হয়।

যে সময় বৃষ্টি হয় বা রোদ হয় না তখন শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ধান না শুকালে বা ধান ভাঙতে না পারলে মালিকেরা মজুরি দেয় না, তখন বাধ্য হয়ে মালিকদের নিকট থেকে শ্রমিকেরা সুদের ভিত্তিতে টাকা কর্জ গ্রহণ করে। আবার এ ঋণের টাকা শোধ করতে করতে আবার নতুন করে ঋণ নিতে হয়। ফলে মালিকের নিকট দায়বদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় শ্রমিকেরা অন্য কোন কাজ করার বা অন্য কোন মালিকের নিকট যাওয়ার কোনো সুযোগ পায় না।

কাজের পরিবেশ না থাকা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকেরা অল্প বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ও কর্মদক্ষতা হারায়। ধূলিময়লার মধ্যে কাজ করার কারণে ফুসফুস দুর্বল হয়ে যায়। ফলে অ্যাজমা জাতীয় মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

চাতাল শ্রমিকদের জন্য মালিকদের পক্ষ থেকে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। কোন চাতাল শ্রমিক মারা গেলেও তার পরিবারের জন্য মানবিক দিক থেকেও কোন প্রকার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না। আবার শ্রমিক যদি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয় তার চিকিৎসা এমনকি চাতালে কাজ করতে করতে যদি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় সেখানেও মালিক নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

নারীশ্রমিকদের মাতৃকালীন ছুটি থাকে না, মাতৃত্বকালীন কোন ভাতা পায় না। "কাজ করলে মজুরি না করলে কিছুই না" এ নীতিতে শ্রমিকেরা চলতে বাধ্য হয়।

চাতাল শ্রমিকরা রোদে পুড়ে, আগুনের তাপে সারাক্ষণ কাজ করে চাল উৎপাদন করে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভূমিকা পালন করে তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে, মানবেতন জীবন যাপন করবে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তাদের সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসবে না এ কেমন সভ্যতা, এ কেমন মানবতা। হায়রে বনি আদমের ভাগ্য, যাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে যে মালিকেরা সম্পদের পাহাড় গড়ছে, তাদের কি কোন দায়দায়িত্ব নেই, নেই কোন অনুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা কোথায় উড়ে গেল। যে সমাজে জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, রাহাজানি নিত্যনৈমিত্তিক সেখানে মানবতা, ইনসাফ, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মানুষ শুধু আর্তনাদ করবে, বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে আর কিছু মানুষ তা দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে, জুলুম, অত্যাচারে মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিবে।

ঈদ বা কোন উৎসব ভাতার ব্যবস্থা নেই। ঈদের সময় খুব বেশি হলে পুরুষদের জন্য একটা লুঙ্গি বা পাঞ্জাবি ও নারীদের জন্য ১টা শাড়ি দিয়ে মালিকেরা দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩ সালে চাতালের জন্য বয়লার আইন তৈরি হয়েছে কিন্তু এ আইনের কোন যথাযথ প্রয়োগ নেই। বয়লারে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও একজন প্রকৌশলী নিয়োগের বিধান থাকলেও মালিক পক্ষ তা কার্যকর করে না। এমনকি বয়লার বিস্ফোরণে যারা নিহত হয় তাদের জন্য নামকাওয়াস্তে কিছু সাহায্য করে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। আহতদের হাসপাতালে গিয়ে কিছু ঔষুধ কিনে দিয়ে আর কোন খোঁজ-খবর নেয় না।

প্রতি বছর বয়লার বিস্ফোরণে নিহত ও আহত হয় শ্রমিকরা। শ্রম দপ্তর সক্রিয় হলে এ ধরনের অপমৃত্যু থেকে শ্রমিকেরা রক্ষা পেতে পারে। চাতাল শ্রমিকরা রোদে পুড়ে, আগুনের তাপে সারাক্ষণ কাজ করে চাল উৎপাদন করে, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভূমিকা পালন করে তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে, মানবেতন জীবন যাপন করবে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তাদের সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসবে না এ কেমন সভ্যতা, এ কেমন মানবতা। হায়রে বনি আদমের ভাগ্য, যাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে যে মালিকেরা সম্পদের পাহাড় গড়ছে, তাদের কি কোন দায়দায়িত্ব নেই, নেই কোন অনুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা কোথায় উড়ে গেল। যে সমাজে জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, রাহাজানি নিত্যনৈমিত্তিক সেখানে মানবতা, ইনসাফ, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মানুষ শুধু আর্তনাদ করবে, বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে আর কিছু মানুষ তা দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে, জুলুম, অত্যাচারে মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিবে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধ্বজাধারীরা তাদের কুকুরের জন্য যে বাজেট রাখে তা দিয়ে এসব বিপন্ন শ্রমিকেরা তাদের সংসারের ব্যয়ভার বহন করতে পারবে। সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা মানবরচিত আইন দ্বারা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর দেয়া বিধানই একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান। এ ব্যবস্থার দিকে জনগণ যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে তত তাড়াতাড়ি এ সমাজ থেকে অশান্তি, অত্যাচার, জুলুম তিরোহিত হবে।

চাতাল শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটানোর জন্য সরকার ও মালিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের সঙ্গে সঙ্গে দরদি হতে হবে। চাতাল শ্রমিকেরা যে শ্রমিক তার স্বীকৃতির জন্য ও তাদের চাকরি নিয়ে যাতে ছিনিমিনি খেলতে না পারে তার জন্য নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগপত্র দিতে হবে। এ ব্যাপারে শ্রম অধিদপ্তরকে অধিকতর নজরদারি করতে হবে।

অন্যান্য মিল-ফ্যাক্টরি, কারখানায় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার যেমন আছে তেমনি চাতাল শ্রমিকদের তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় লক্ষ্যে চাতালে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে। চাতালের মালিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মজুরির প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও সেই নির্ধারিত মজুরি নিয়মিত পরিশোধ করার জন্য মালিকদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

২০০৬ সালের ও পরবর্তীতে সংশোধিত শ্রম আইনের বিধান অনুসারে বোনাস, ওভার টাইম, চিকিৎসাভাতা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতির ক্ষয়পূরণ দেয়ার জন্য চাতাল মালিকদের বাধ্য করতে হবে। বৃষ্টির জন্য শ্রমিকদের যখন কাজ থাকে না তখন তাদের পরিবারের সাহায্যের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দিতে হবে ও সহজ শর্তে পরিশোধের বিধান রাখতে হবে। নারীশ্রমিকদের জন্য সকল কিছু আলাদা করতে হবে। বিশেষ করে টয়লেট, বিশ্রামের জায়গা, শিশু সন্তানদের রাখার ব্যবস্থা ও বেতনের বৈষম্য-দূর করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বয়লার শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাসহ পুরাতন বয়লার পরিবর্তন করা অবশ্য জরুরি। শ্রেণী সংগ্রাম নয় বরং মালিক শ্রমিকের সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা দূর করার জন্য পরিবেশ তৈরি করাই মালিকদের অন্যতম দায়িত্ব।

লেখক : *কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি*
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শিশু গৃহকর্মীর ওপর নির্মমতা ক্ষমাহীন বর্বরতা

মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত

রোগা, দরিদ্র, নিঃস্ব শিশু, সারা গায়ে জখম, ক্ষতবিক্ষত শরীর, কালো জমাটবাঁধা রক্তের দাগ। নির্মম নির্যাতনে ফুলে ওঠা চোখ, দেহে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া সাদা শফেদ চামড়ার দাগ। হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরানো কিংবা পুরনো কাপড়ে ঢাকা শিশু শ্রমিকের লাশের ছবি। এ সবই এখন পত্রিকার পাতা, টিভি আর সোস্যাল মিডিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক খবর। এদের বেশির ভাগই গৃহশ্রমিক। এদের ওপর নির্যাতন নির্মমতার কোনো শেষ নেই।

সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সোস্যাল মিডিয়ায় গৃহকর্মী নির্যাতনবিষয়ক কয়েকটি খবর জনমনে আলোড়ন ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। প্রতিটি নির্যাতনের ঘটনাই সোস্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। সমাজের সকল স্তরের মানুষ গৃহকর্মী নির্যাতন বিশেষ করে শিশু গৃহকর্মীদের ওপর নির্মম নির্যাতনকারীদের ধিক্কার দিতে থাকে। রোগা, দরিদ্র, নিঃস্ব শিশু, সারা গায়ে জখম, ক্ষতবিক্ষত শরীর, কালো জমাটবাঁধা রক্তের দাগ। নির্মম নির্যাতনে ফুলে ওঠা চোখ, দেহে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া সাদা শফেদ চামড়ার দাগ। হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরানো কিংবা পুরনো কাপড়ে ঢাকা শিশু শ্রমিকের লাশের ছবি। এ সবই এখন পত্রিকার পাতা, টিভি আর সোস্যাল মিডিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক খবর। এদের বেশির ভাগই গৃহশ্রমিক। এদের ওপর নির্যাতন নির্মমতার কোনো শেষ নেই। সাধারণত ৮-১০ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে ১৬-১৭ বছর বয়সী গৃহকর্মী দেখা যায় শহরের বিভিন্ন বাসা বাড়িতে। এদের মধ্যে মেয়েশিশুর সংখ্যাই বেশি। ছোটদের মধ্যে ছেলে শিশুও রয়েছে।

গত ১ নভেম্বর 'ক্ষমাহীন বর্বরতা' শিরোনামে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের এমনই একটি খবরের শিরোনামে আমার চোখ আটকে যায়। অনলাইন নিউজ ভার্সনে বাংলাদেশ প্রতিদিন যে ছবিটি ব্যবহার করে তা ছিল এক কথায় বিবেক নাড়া দেয়া গা শিউরে ওঠার মতো ছবি। ছবিতে দেখা যায় একজন গৃহকর্মী মুমূর্ষু অবস্থায় হুইল চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খবরে বিস্তারিত যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, রাজধানীর খিলগাঁওয়ে এক মানবাধিকারকর্মীর বাসায় নির্যাতনের শিকার 'হাওয়া আক্তার' নামে ১৪ বছরের এক গৃহকর্মীকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিকালে দক্ষিণ বনশ্রী এলাকার বাসা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় গৃহকর্তা ও মানবাধিকার কর্মী শরীফ চৌধুরীকে আটক করা হয়। ঢামেক সূত্র জানায়, হাওয়া ৪ মাস আগে তার মামাতো বোনের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা বেতনে দক্ষিণ বনশ্রীর ১১ নম্বর রোডের ৪৩ নম্বর বাসার ৬ তলায় শরীফ চৌধুরীর বাসায় কাজ নেয়। সেখানে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে (না পারায়) তার সারা শরীরে লোহার খুনতি দিয়ে ছ্যাঁকা দিতেন বাসার গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী। এমনকি ওই বাসায় কাজে যোগ দেয়ার পর থেকে স্বজনদের সঙ্গে হাওয়াকে

যোগাযোগ করতেও দেয়া হতো না। টানা চার মাস তার কোনো খোঁজ না পেয়ে খিলগাঁও থানা পুলিশের শরণাপন্ন হন স্বজনরা। পরে নির্যাতনের এ সংবাদ পেয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ।

গৃহকর্মী হাওয়া আক্তারের এ খবরটি একটি মাত্র খবর নয়। বাংলাদেশে প্রতিদিনই এরকম শত শত হাওয়া আক্তারের বীভৎস নির্যাতনের খবর মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। গত ১৭ অক্টোবর বরিশালে লামিয়া নামে এক শিশু গৃহকর্মীকে নির্মম নির্যাতনের অভিযোগে আশরাফুল ইসলাম নামে এক এনজিও কর্মকর্তার স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ। চোখ ফোলা ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় লামিয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পলাতক থাকায় গৃহকর্তা আশরাফুলকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। শিশু গৃহকর্মী লামিয়াকে উদ্ধারের খবর ফলাও করে প্রচার করে দেশের সকল টিভি মিডিয়া। সেদিন টিভিতে শিশু গৃহকর্মী লামিয়ার ওপর নির্যাতনের বর্ণনা শুনে চোখে পানি ধরে রাখতে পারিনি। লামিয়ার চোখ ফোলা বীভৎস চেহারার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়েও থাকতে পারিনি। তার ওপর এতই ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়েছে যে তার দিকে তাকালে যে কারো চোখেই অবলীলায় পানি আসবে। যমুনা টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, নির্যাতনের কারণে ক্ষতবিক্ষত ১০ বছরের শিশু লামিয়ার শরীর। কথা ছিল ভর্তি করা হবে স্কুলে, দেয়া হবে তিন বেলা খাবার। খাবার না পেলেও নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে মা-হারা শিশুটিকে। বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের পর হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ। যমুনা টেলিভিশনকে লামিয়া বলছিল, তাকে প্রথমে থাপ্পড় মারা হয়, তার পর বেলুন দিয়ে পিটানো হয়, মারতে মারতে বেলুন ভেঙে গেলে বেত দিয়ে মারা হয়। তাকে লাথি মারা হতো। ফ্লোরে ফেলে বুকের ওপর পা দিয়ে মাড়ানো হতো। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, নির্যাতনের ফলে রক্তক্ষরণ হয়েছে লামিয়ার মাথায়।

টিভি রিপোর্টে শিশুগৃহকর্মী লামিয়াকে নির্মম নির্যাতনের কথা তারই মুখে শুনছিলাম আর ভাবছিলাম এমন বর্বরতা মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? একটি নিষ্পাপ শিশুকে পায়ের নিচে ফেলে মাড়ানোর সময় এনজিও কর্মকর্তার একটুও কি বুক কাঁপেনি? লোহার খুন্তি দিয়ে হাওয়া আক্তারকে ছ্যাঁকা দেয়ার সময় একটুও কি মানবাধিকার কর্মীর হৃদয় কাঁপেনি? এরা কিসের মানবাধিকারকর্মী, কিসের এনজিও কর্মকর্তা। এদেরকে তো মানুষ ভাবতেই লজ্জা হয়। দু'মুঠো ভাতের জন্য নিষ্পাপ এ শিশু কিশোরীরা নিজেদের দুরন্তপনা শৈশব কৈশোরের স্বাদ-আহলাদ বাদ দিয়ে নিজের মা-বাবাকে ছেড়ে নিজের ঘর ছেড়ে গৃহকর্মীর কাজে নিয়োজিত। এদের কেউ কেউ এতিম, কেউ নিঃস্ব। তাই বলেই কি এদের ওপর এত নির্যাতন? যেসব বাসায় গৃহকর্মীদের ওপর এমন নির্মমতা চলে সেসব বাসার মানুষগুলো দেখি সবাই উচ্চ শিক্ষিত। এরা পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে মাত্র, কারণ এদের পড়াশোনা এদেরকে মানবতা মনুষ্যত্ব কিছুই শিখাইনি। একজন শিক্ষিত মানুষ কিভাবে একটা শিশুর পুরো শরীরে খুন্তির ছ্যাঁকা দিতে পারে। অট্টালিকায় বসবাস করা মানুষদের কাছে তার সন্তান যেমন দামি। একজন নিঃস্ব গরিব মানুষের কাছেও তার সন্তান হিরের টুকরোর চাইতেও দামি। আজ অপরের সন্তান বলে, দু'মুঠো খাবার দেই বলে গৃহকর্মীদের ওপর কথায় কথায় নির্যাতন চারিত্রিক দেউলিয়াত্ব আর মানবের ভিতর বসবাস করা পশুত্বের বহিঃপ্রকাশ।

দু'মুঠো ভাতের জন্য নিষ্পাপ এ শিশু কিশোরীরা নিজেদের দুরন্তপনা শৈশব কৈশোরের স্বাদ-আহলাদ বাদ দিয়ে নিজের মা-বাবাকে ছেড়ে নিজের ঘর ছেড়ে গৃহকর্মীর কাজে নিয়োজিত। এদের কেউ কেউ এতিম, কেউ নিঃস্ব। তাই বলেই কি এদের ওপর এত নির্যাতন? যেসব বাসায় গৃহকর্মীদের ওপর এমন নির্মমতা চলে সেসব বাসার মানুষগুলো দেখি সবাই উচ্চ শিক্ষিত। এরা পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে মাত্র, কারণ এদের পড়াশোনা এদেরকে মানবতা মনুষ্যত্ব কিছুই শিখাইনি। একজন শিক্ষিত মানুষ কিভাবে একটা শিশুর পুরো শরীরে খুন্তির ছ্যাঁকা দিতে পারে। অট্টালিকায় বসবাস করা মানুষদের কাছে তার সন্তান যেমন দামি। একজন নিঃস্ব গরিব মানুষের কাছেও তার সন্তান হিরের টুকরোর চাইতেও দামি। আজ অপরের সন্তান বলে, দু'মুঠো খাবার দেই বলে গৃহকর্মীদের ওপর কথায় কথায় নির্যাতন চারিত্রিক দেউলিয়াত্ব আর মানবের ভিতর বসবাস করা পশুত্বের বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশে বহু শিশু নানা ধরনের শ্রমে নিয়োজিত। বিবিএসের এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ১৮টি খাতে ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ৮৯৪ জন শিশু 'শিশুশ্রমে' নিয়োজিত রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৬৯০ জন মেয়েশিশু। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এর মধ্যে ২ লাখ ৬০ হাজার শিশু মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শিশুশ্রম বেশি দেখা গেছে কৃষিক্ষেত্রে ও কলকারখানায়, সেখানে ১০ লাখের বেশি শিশু কাজ করে। সবচেয়ে বেশি সাড়ে পাঁচ লাখ শিশু উৎপাদন খাতে বা কলকারখানায় কাজ করে। দোকানপাটে ১ লাখ ৭৯ হাজার শিশু, নির্মাণশিল্পে ১ লাখ ১৭ হাজার শিশু কাজ করে। শিশুশ্রমে নিয়োজিতদের ৫৭ শতাংশের কাজই অস্থায়ী। এক জরিপে বলা হয়েছে, গ্রামীণ শিশুদের ৭৯ শতাংশই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তারা কখনও মাতা-পিতার সহায়তা করে। কখনও খণ্ডকালীন স্বজন ও প্রতিবেশীদের জমিতে কাজ করে। আরেক জরিপে বলা হয়, দেশে মোট শিশুশ্রমিকের ৬৬ শতাংশ কৃষিতে, ১৮ শতাংশ শিল্পখাতে, ৪ শতাংশ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১২ শতাংশ গৃহভৃত্য অন্যান্য খাতে। বিশ্ব শ্রমসংস্থার আইএলও-র ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট শিশুশ্রমিক প্রায় ৩২ লাখ। তাদের মধ্যে ৪ লাখ ২০ হাজার শিশু গৃহকর্মে নিয়োজিত? আর গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে ৭৫ ভাগই হলো কন্যাশিশু। এ ছাড়া, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে ১ লাখ ৪৭ হাজার শিশু শুধু রাজধানী ঢাকাতে কাজ করে। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১১১ জন গৃহকর্মী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে। মারাত্মক জখম হয়েছে আরো অনেকে। মানবাধিকার কর্মীরা বলেছেন, গৃহকর্মী

নির্যাতনের বাস্তবচিত্র আরো ভয়াবহ। কারণ, অনেক ঘটনাই পরিসংখ্যানে আসছে না।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের এক গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মে পর্যন্ত ৬৫ শিশু গৃহকর্মীর ওপর চালানো হয় মারাত্মক নির্যাতন। একই সময়ে ২১ শিশু গৃহকর্মীকে ধর্ষণ এবং ২১ জনকে হত্যা করা হয়েছে। মোঃ কামরুজ্জামান ও আব্দুল হাকিম A Review on Child Labour Criticism in Bangladesh : An Analysis-তে গৃহস্থালিতে শিশুশ্রমিক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। তাতে উল্লেখ করা হয় গহস্থালির শিশুশ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ৬৬.৬৭%, বিনোদন থেকে বঞ্চিত ৫৩.৩৩%, গালাগালির শিকার ৩৩.৩৩%, শারীরিক নির্যাতনের শিকার ৪৬.৬৭%, চাকরিচ্যুতির হুমকি ৪৬.৬৭%, সাধ্যাতীত কাজ করতে হয় ৬৩.৩৩%, যৌন হয়রানির শিকার ১৬.৬৭%, নিরাপত্তাহীনতা ৪০.০০% এবং মানসিক তীব্র চাপে থাকে ৬৭.৬৭% শিশু শ্রমিক। ২০১৭ সালে শিশু হত্যা এবং ধর্ষণ নিয়ে ১০টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে শিশু অধিকার ফোরাম। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৭ সালে গড়ে প্রতিমাসে শিশু হত্যা হয়েছে ২৮টি এবং ৪৯ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আর এসবের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাওয়ার উদাহরণ নেই। বরং বিচারহীনতা এবং বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭ সালের ১২ মাসে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে- মোট ৩ হাজার ৮৪৫ শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৭১০ জন শিশু বিভিন্ন ধরনের অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে। ৮৯৪ শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বিএসএএফ ও পুলিশ সদর দফতরের তথ্যানুসারে, ২০১৮ সালে প্রথম ছয় মাসে ৩৫১ জন শিশু ধর্ষণ এবং ২১৬ জন হত্যার শিকার হয়েছে, যা মোট হত্যার ১১.১৯ শতাংশ।

> গৃহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ২১ ডিসেম্বর 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা, ২০১৫' নামে একটি নীতিমালা প্রকাশ করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একাধিক সভায় বিভিন্ন মানবা-ধিকার ও অন্যান্য নেটওয়ার্কিং সংগঠন নীতিমালাটিকে আইনে পরিণত করার জন্য দাবি জানিয়ে এলেও এটিতে এখনও আইনে পরিণত করে কার্যকর করা হয়নি। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা অনুযায়ী ১৮ বৎসরের কম বয়সী এবং হালকা কাজের জন্য ১২ বৎসর বয়সী শিশুদের (শিক্ষাগ্রহণকে বিঘ্নিত না করে) চুক্তি সাপেক্ষে গৃহকর্মে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাবনা আছে। কিন্তু এই নীতিমালা কেবল কাগজে-কলমেই আছে, বাস্তবে তার যথাযথ প্রয়োগ নেই।

শিশুশ্রমিকরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর মধ্যে বেশির ভাগ নির্যাতনের খবরই গৃহস্থালির শিশুশ্রমিকদের ক্ষেত্রে। যাদের বেশির ভাগ খবরই প্রকাশিত হয় না। গৃহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ২১ ডিসেম্বর 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা, ২০১৫' নামে একটি নীতিমালা প্রকাশ করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একাধিক সভায় বিভিন্ন মানবাধিকার ও অন্যান্য নেটওয়ার্কিং সংগঠন নীতিমালাটিকে আইনে পরিণত করার জন্য দাবি জানিয়ে এলেও এটিতে এখনও আইনে পরিণত করে কার্যকর করা হয়নি। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা অনুযায়ী ১৮ বৎসরের কম বয়সী এবং হালকা কাজের জন্য ১২ বৎসর বয়সী শিশুদের (শিক্ষাগ্রহণকে বিঘ্নিত না করে) চুক্তি সাপেক্ষে গৃহকর্মে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাবনা আছে। কিন্তু এই নীতিমালা কেবল কাগজে-কলমেই আছে, বাস্তবে তার যথাযথ প্রয়োগ নেই। অথচ ২০১১ সালে হাইকোর্ট গৃহকর্মী নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দেয়। সম্প্রতি উন্নয়ন অন্বেষণের 'ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স : ডিভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেশন' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, ৫৭ দশমিক ৫ শতাংশ শিশু গৃহকর্মী দৈনিক নয় ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করে। ১২ শতাংশ শিশু গৃহকর্মীর কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই। অথচ একজন শিশু গৃহকর্মী মাসে গড়ে এক হাজার ১৮৫ টাকা মজুরি পায়। কেউ কেউ তাও পায় না। পায় না ঠিকমতো খাবার-দাবার ও পোশাক-আশাক। প্রাপ্তবয়স্ক গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রেও একই দৈন্যদশা বিদ্যমান।

গৃহকর্মী নির্যাতন ও তাদের অধিকারকে অবজ্ঞা করা আমাদের দীর্ঘদিনের একটি সামাজিক ব্যাধি। শিশু গৃহকর্মীর ওপর নির্মমতা ক্ষমাহীন বর্বরতারই নামান্তর। বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়ার পরও ইসলাম শিশুশ্রমিকদের ব্যাপারে যা নির্দেশনা দেয় তা আমরা মেনে চলি না। সোস্যাল মিডিয়ার কল্যাণে প্রায়ই দেখা যায় শিশু গৃহকর্মীকে নিয়ে খাবার হোটেলে গিয়ে তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা না করে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সম্প্রতি দাঁড়িয়ে ট্রেন জার্নি করা এক শিশু গৃহকর্মীর ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ছবিতে দেখা যায় গৃহকর্তা ট্রেনের সিটে বসে আরামে ঘুমাচ্ছেন আর তার গৃহকর্মী দাঁড়িয়েই ট্রেনে আরোহণ করছে, তার জন্য টিকিট কেটে সিটের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। অধীনস্থদের ব্যাপারে মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলে কারীম (সা) বিদায় হজের ভাষণে সতর্ক করে বক্তব্য দিয়েছেন। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: (এরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। অতএব তোমরা যা খাও, তাদেরকে তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং তাদের ওপর তাদের সাধ্যাতীত কাজ চাপিও না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ)। আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, এ উম্মাতের অধিকাংশ হবে গোলাম ও ইয়াতিম? তিনি বলেন, হ্যাঁ, অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানের মত তাদের সাথে ব্যবহার করো এবং তোমরা যা আহার করো তা তাদেরকে আহার করাও। সাহাবীগণ বলেন, দুনিয়াতে কোন জিনিস আমাদের উপকারে আসবে? তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে তুমি যে ঘোড়া প্রতিপালন করো এবং যে গোলাম তোমার দায়িত্ব পালন করে। সে যদি নামায পড়ে, তবে সে তোমার ভাই। (তিরমিযি, আহমাদ)।

লেখক : *প্রাবন্ধিক ও গবেষক*

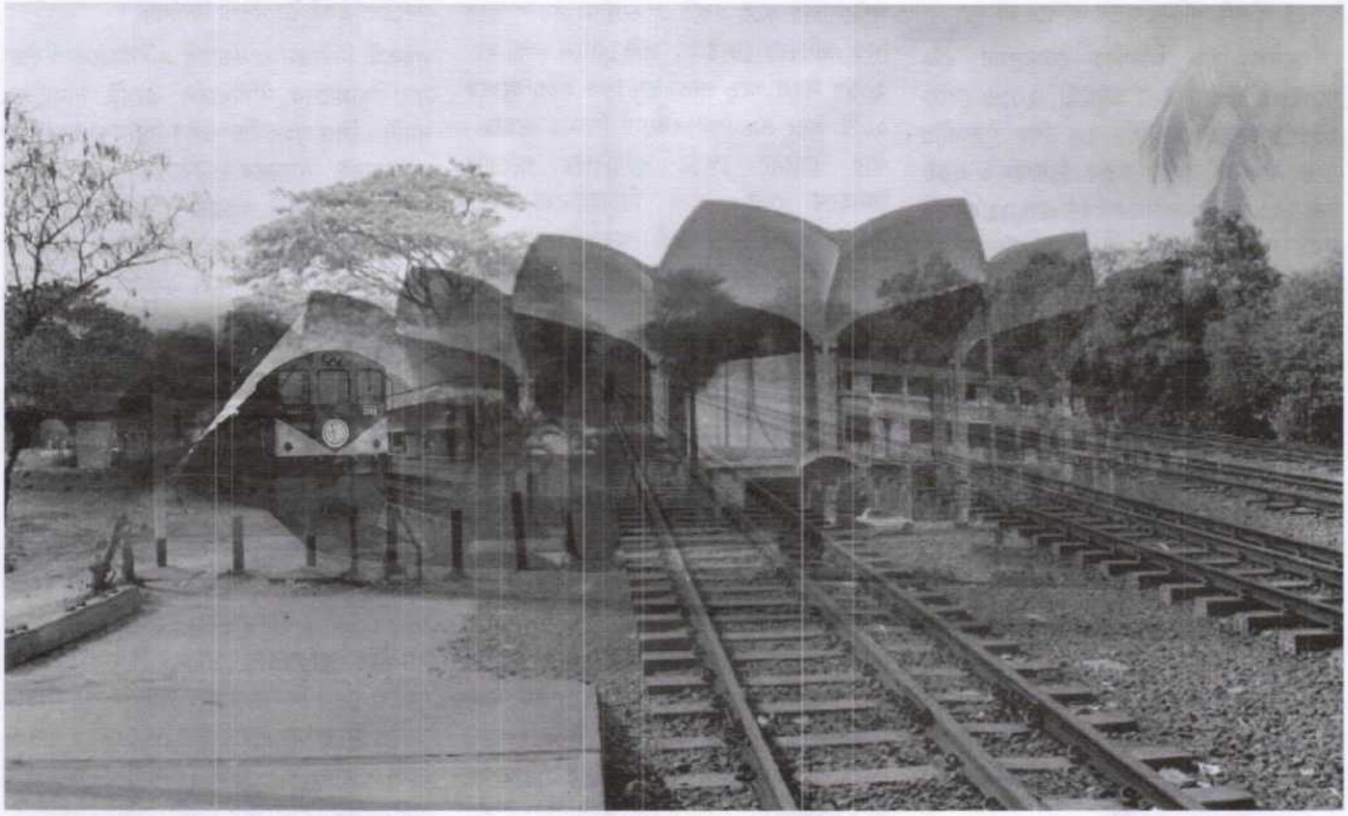

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়ে বেশ ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। প্রায় ৩০০ শত ছোট বড় ব্রিজ, কালভার্ট নষ্ট করা হয়। বেশ কিছু ইঞ্জিনও কোচ নষ্ট হয়ে যায়। রেললাইনেও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ে পরবর্তী গঠিত সরকার সমূহ রেল পুনর্বাসনে সামগ্রিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ অংশের রেল-ব্যবস্থা ছিল কলকাতামুখী। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে রাজধানীহেতু রেলব্যবস্থা কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর কোন সরকারেই রেলকে ঢাকামুখী করার কোন চিন্তাই করেনি। তা ছাড়া ৭০, ৮০ ও ৯০ দশক পর্যন্ত বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে যে হারে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, তার বিপরীতে রেলের জন্য প্রতি বৎসর বর্ধিত কিছু ভর্তুকি দেয়া ছাড়া তেমন কিছু করা হয়নি। এ সময়ে কথা আসতে থাকে যে, রেলের সেবা একান্ত

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ রেলওয়ে বেশ ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। প্রায় ৩০০ শত ছোট বড় ব্রিজ, কালভার্ট নষ্ট করা হয়। বেশ কিছু ইঞ্জিনও কোচ নষ্ট হয়ে যায়। রেললাইনেও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ে পরবর্তী গঠিত সরকার সমূহ রেল পুনর্বাসনে সামগ্রিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ অংশের রেল-ব্যবস্থা ছিল কলকাতামুখী। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে রাজধানীহেতু রেলব্যবস্থা কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর কোন সরকারেই রেলকে ঢাকামুখী করার কোন চিন্তাই করেনি।

নিম্নমানের, গাড়ি চলার কোন সময়সীমা নেই, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ। অধিকন্তু প্রত্যেক গ্রামে-গঞ্জে পাকা রাস্তা হচ্ছে। বাস, ট্রাক বাড়ির সামনে থেকে মানুষ ও মালামাল নির্দিষ্ট স্থানে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, রেলের আর প্রয়োজন আছে কি না? এভাবে মানুষ ভাবতে শুরু করে। পত্র-পত্রিকায় রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বিশেষে যে সকল নেতিবাচক কথা লেখা হচ্ছিল : তাতে এদেশে রেলপথের প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাচ্ছিল বলে মনে হতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর বিগত বৎসরগুলোতে রেলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে এ ব্যাপারে দেশবাসী তেমন কিছু জানতেই পারেনি। যাত্রী হিসেবে দেশবাসী দেখছে স্টেশনে এসে টিকেট নিয়ে বসে আছে; কিন্তু ট্রেনের দেখা নেই। কেন এটা হয়েছে? ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইন ১টি। তার মধ্যে আসা-যাওয়াসহ কয়টি গাড়ি চালানো যাবে? তা ছাড়া

আরো রয়েছে মালবাহী ও কনটেইনারবাহী ট্রেন। সুতরাং, রেলজটের কারণে বিলম্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ দেশের মানুষতো জানে না যে, ব্রিজ-কালভার্টের ব্যবস্থা পাকিস্তানি আমলে করা হলেও আজ পর্যন্ত ডবল লাইন করার সক্রিয় কোন কার্যক্রম নেয়া হয়নি। লাকসাম থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নাই। যা পাকিস্তান আমলে সার্ভে করা হয়েছিল। যদি ঐ সময়ে তা বাস্তবায়িত হতো প্রায় ৯০ কি. মি. রেললাইন কমে যেত। আর ঢাকা-চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ ডাবল লাইন হলে চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীগণ কাজের প্রয়োজনে দৈনিক আসা যাওয়া করতে পারতেন। অনুরূপ অন্যান্য শহরগুলো থেকে ঢাকামুখী রেলব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে ঢাকা এত যানযটের শহরে পরিণত হতো না। তা ছাড়া যাত্রীরা দেখছে কতটুকু যাওয়ার পর ইঞ্জিন বিকল? ঘন্টার পর ঘন্টা পথে বসে থাকতে হচ্ছে। কখন আরেক ইঞ্জিন এসে তাদের উদ্ধার করবে এ চিন্তায় তারা রেল বিভাগের ওপর বিরক্ত। বর্তমান পর্যায়ে এটা রেলের জন্য স্বাভাবিক। বর্তমানে যে পরিমাণ ইঞ্জিন আছে; তার অধিকাংশ মেয়াদোত্তীর্ণ। স্বল্প সংখ্যক ইঞ্জিনই এর মধ্যে নতুন সংযোজিত হয়েছে। তদুপরি নিয়মিত মেরামতের বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রতুল।

সাধারণ যাত্রী কোচের কথা বাদ দিলাম। এসি ও প্রথম শ্রেণীর কোচে বৃষ্টির পানি পড়ে। কারণ অধিকাংশ কোচ মেয়াদোত্তীর্ণ। তাই পুনঃ মেরামতের অপেক্ষায়। খুব স্বল্পসংখ্যক কোচ ও ওয়াগন নতুন আনা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনার সামান্য। সুতরাং গাড়িতে বাতি নেই, পাখা চলে না এবং অনেক ক্ষেত্রে ৩য় শ্রেণীর সিট গুলি বসার মত নয়। ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যথাগতিতে গাড়ি চলতে পারে না। প্রায় জায়গায় গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তাতে ট্রেন দেরি হওয়া, গাড়ি লাইনচ্যুত হওয়া এবং ঘনঘন ট্রেন দুর্ঘটনার কারণে জান-মাল ও সময়ের ক্ষতি করে মানুষ ট্রেনের যাত্রী হবে কেন এবং মালামাল ট্রেনে পাঠিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে কেন?

অপর দিকে সড়ক মহাসড়ক বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন নতুন মডেলের অত্যাধুনিক লাক্সারি বাস এবং দ্রুতগতিতে কম সময়ে যথাযথস্থানে চলে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষ রেলমুখী হবে কোন দুঃখে? অথচ রেলের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে এর এ দৈন্যদশা পরিবর্তনে কাজ করতে পারতো দেশের সরকার, রেলওয়ে প্রশাসন এবং সক্রিয় শ্রমিক সংগঠনগুলো। কিন্তু বিগত চল্লিশ বৎসরে সরকারসমূহ রেলওয়ের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় না করে সড়ক ও জনপথ মন্ত্রণালয়ে যুক্ত করে জাতীয় বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে রেলকে উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হবার নয়। কারণ উন্নয়নমুখী সামান্য বাজেটের টাকা খরচের জন্য যোগাযোগ বিভাগের কোন মন্ত্রী, আমলা যথাযথ নজর দেবে তা কল্পনা করা যায় না।

তা ছাড়া রেলের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে যে বিশাল অংকের টাকা জোগান দেয়া প্রয়োজন; সেদিকে মনোযোগ দেয়ার সময় পাওয়া যায়নি। ফলে দাতাসংস্থা তথাঃ এডিবি, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএর পরামর্শে বিগত বৎসরগুলোতে রেললাইন সংকোচন, দক্ষকর্মচারী সংখ্যা কমানো, পুনঃনিয়োগ না করা, চাহিদা অনুসারে রেলিংস্টক পূরণ না করা, নিয়মিত পুনর্বাসন ও মেরামত খাতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না দেয়া, যমুনা সেতুতে রেললাইনের ব্যবস্থা না করে, আন্দোলনের মুখে ল্যাংড়া সেতু নির্মাণ করা হয়। বিশ্বব্যাংক ও এডিবি এর সুপারিশে এই পর্যন্ত ১১ বার প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য এই রেলওয়েকে ২ জোনে বিভক্ত করে ২২০ জন কর্মকর্তার স্থলে প্রায় ১৭০০ জন কর্মকর্তা বাড়ানো হয়েছে। অপর দিকে কর্মচারী কমানো হয়েছে প্রায় ২৫,০০০ হাজার। তদুপরি ২০০৭ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে রেলকে এডিবি এর তত্ত্বাবধানে বৎসরপ্রতি কয়েক হাজার কোটি টাকা লোন দিয়ে আয় থেকে দায় শোধ পর্যায়ে উন্নীত করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল; তা বর্তমানে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা লোকসানের ঘরে দাঁড়িয়ে ঐ প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছে তা মাননীয় সরকার বাহাদুর পর্যালোচনা করে দেখবেন কি?

রেলওয়েতে প্রায় ৫০০ ক্যাডারভুক্ত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা রয়েছেন। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হলে তাদের কয়েক শত জনে মিলে এতটুকু রেল যোগ্যতার সাথে পরিচালনা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। অনেকের সেই যোগ্যতাও আছে। এ ছাড়াও আরো প্রায় ১০০০-১২০০ রয়েছে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা। কর্মকর্তার এ বিশাল বহর রেল পরিচালনা ও উন্নয়নে বিগত চল্লিশ বছরে কতটুকু অবদান রেখেছেন? সরকারগুলোর রেলের প্রতি অনীহা ও অবহেলার সুযোগে কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্বে দেখতাম জিলাভিত্তিক গ্রুপিং। বর্তমান সময়ে যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তাদের সাথে সম্পৃক্ততার পরিচয়ে বেশ নিরিবিলি চাকরি কালীন সময়ে অতিবাহিত করেছেন।

এসব কর্মকর্তা গতিশীল দুর্নীতিতে গা-ভাসানো ছাড়া বিপরীত অবস্থানে মোকাবেলার সাহস দেখিয়েছেন খুব কম সংখ্যক। অবশ্য এ জন্য অনেক সৎ কর্মকর্তাকে আর্থিক, সামাজিক, মানসিক লাঞ্ছনার শিকারও হতে হয়েছে। ফলে রেলের উন্নয়নের জন্য চাহিদার বিপরীতে যাই পাওয়া গেছেঃ তা থেকে মেরামত খাতে ৪০% এবং উন্নয়ন খাতে ৬০% খরচ করে দিব্যি আরামে চাকরির মেয়াদকাল শেষ করেছেন কর্মকর্তারা। বর্তমানে যারা চাকরিতে আছেন তারা জনবল ও বাজেটের অভাবে আশা নিরাশার দোলাচলে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

এ ক্ষেত্রে কিছু গতিশীলতা আনতে পারত রেলওয়েতে কর্মরত শ্রমিক সংগঠনগুলো। শ্রম আইনে একটি প্রতিষ্ঠানে তিনটির বেশি শ্রমিক সংগঠন না থাকার আইন থাকলেও বিগত সাতচল্লিশ বৎসরে রেলওয়েতে নিবন্ধনকৃত শ্রমিক সংগঠন রয়েছে ৯টি। যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, তিনি তার দলের একটি, কখনো দুইটি ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন দিয়েছেন। আরো সৌভাগ্য হচ্ছে প্রতিটি ইউনিয়নের একটি ভগাংশ। এ ভগাংশের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে সরকারি দলের লেজুড়বৃত্তি ব্যতীত শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন আন্দোলন খেলা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। অবশ্য নেতাগিরিকে যারা পেশা হিসাবে নিয়েছে তারা বেশ দিব্যি আরামে সংশ্লিষ্ট চাকরি না করে প্রশাসনের বদান্যতায় কাউকে ডিঙ্গিয়ে অন্যকে পদোন্নতি দেয়া, সুবিধাজনক স্থানে বদলি করানো, জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গ করে বাসার সুবিধা দেয়া। এটুকু কাজ তাও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে মহান নেতৃত্বের আসনে সক্রিয় রেখেছেন। আসলে একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যাবে; সংগঠনগুলির ভগ্নাংশের কাজটি করেছেন একটি বিশেষ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাগণ। তা বজায় রাখছেন তাদের স্বার্থেই।

এ সংগঠনগুলোর মধ্যে 'বিআরইএল' এর সঠিক অংশ ব্যতীত আর সকল ইউনিয়ন পর্যায়ক্রমে 'শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ' নামে

> শ্রম আইনে একটি প্রতিষ্ঠানে তিনটির বেশি শ্রমিক সংগঠন না থাকার আইন থাকলেও বিগত সাতচল্লিশ বৎসরে রেলওয়েতে নিবন্ধনকৃত শ্রমিক সংগঠন রয়েছে ৯টি । যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, তিনি তার দলের একটি, কখনো দুইটি ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন দিয়েছেন । আরো সৌভাগ্য হচ্ছে প্রতিটি ইউনিয়নের একটি ভগাংশ । এ ভগাংশের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে সরকারি দলের লেজুড়বৃত্তি ব্যতীত শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন আন্দোলন খেলা ছাড়া কিছুই করার ছিল না । অবশ্য নেতাগিরিকে যারা পেশা হিসাবে নিয়েছে তারা বেশ দিব্যি আরামে সংশ্লিষ্ট চাকরি না করে প্রশাসনের বদান্যতায় কাউকে ডিঙ্গিয়ে অন্যকে পদোন্নতি দেয়া, সুবিধাজনক স্থানে বদলি করানো, জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গ করে বাসার সুবিধা দেয়া । এটুকু কাজ তাও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় করার সুযোগ পেয়ে নিজকে মহান নেতৃত্বের আসনে সক্রিয় রেখেছেন ।

ঐক্যবদ্ধ হয় । অথচ ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লিগ পুনর্গঠনের পর রেলের বিরুদ্ধে যে সকল নেতিবাচক দিকগুলি পর্যালোচনা করে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে রেল শ্রমি কর্মচারীদের উন্নয়নে একটি সুপারিশমালা তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । তখনকার সময়ে রেলের অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক মতামত সংগ্রহ করা হয় । তা ছাড়া রেলের বাইরে চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং তৎকালীন স্টিলমিলের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে প্রায় তিন মাস সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টার পর ১৯৯৩ সালের দিকে রেলের সামগ্রিক বিভাগ ও শপভিত্তিক একটি সুপারিশমালা তৈরি করে তা সরকার, রেল কর্তৃপক্ষ, জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়, দাতাসংস্থাগুলোর স্থানীয় প্রতিনিধি ও তাদের হেড কোয়ার্টারে এবং জেলা পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী সংস্থা ও দায়িত্বশীলদের নিকট পৌঁছানো হয় । তবে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক বরাবরে পেশ করার কারণে রেলের বিষয়গুলি নিয়ে জাতীয় পত্রিকাসমূহে লেখালেখি শুরু হয় । এরপর সম্পূর্ণ ৯০ দশক ধরে অত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ সালে তথ্যবহুল বাৎসরিক বুলেটিন বের করে ব্যাপকভাবে বিলি করা হয় । রেলের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠান করা হয় । যাতে তদানীন্তন যোগাযোগমন্ত্রীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যোগাযোগ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সচিব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । এর সুপারিশমালাও ব্যাপকভাবে বিলি করা হয় । ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে রেল সংকোচন নয় বরং সম্প্রসারণের পক্ষে পত্র-পত্রিকাসহ ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে । সর্বোপরি যমুনা বহুমুখী সেতুতে রেললাইন স্থাপনের বিষয় নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করা হয় । মূল প্রস্তাবনায় রেললাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত থাকলেও দেশী-বিদেশী চক্রান্তের কারণে বাস্তবায়ন পর্যায়ে রেললাইনের ব্যবস্থা না রেখে যমুনা সেতুর মূল নকশা অনুমোদন করা হয় । আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি, শুরুতেই যদি রেললাইন না থেকে, ট্রাফিক যদি একবার পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে রেলের নিজস্ব উদ্যোগে লাইন স্থাপন এবং ট্রাফিক ফিরিয়ে আনা কোনটাই সম্ভব হবে না । ফলে রেলের লোকসান কয়েকগুণ বেড়ে যাবে এবং রেলকে বাঁচিয়ে রাখাও সম্ভব হবে না ।

সুতরাং সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক আমরা এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পর্যায়ক্রমে রেলের অন্যান্য সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মকর্তা, কর্মচারী, জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ, জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ ব্যাপক যোগাযোগ, সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং এবং জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার ও স্মারকলিপি পেশ করার মাধ্যমে সরকারকে যমুনা সেতুর শুরুতে রেললাইন রাখতে বাধ্য করা হয় ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নকশার শুরুতে রেললাইনের ব্যবস্থা না রাখায় এই লাইনের মাঝখানে হওয়ায় কথা থাকলেও তড়িঘড়ি করে সেতুর একপাশে হওয়াতে রেলের লোড নিতে স্থায়ীভাবে সমস্যার সৃষ্টি হয় । তা ছাড়া ঐ সময়ে সেতুর ওপর ব্রডগেজ না মিটারগেজ হবে এ সমস্যার সমাধান ও ব্রিজ কর্তৃপক্ষ করতে পারছিল না । অত্র সংগঠনই প্রথম ডুয়েল গেজের যৌক্তিকথা তুলে ধরে প্রচারণা চালালে অবশেষে তাই গ্রহণ করা হয় । এ পুরো দশকে রেল শ্রমিকদের আন্দোলন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ।

একদিকে সরকারি দলের ছত্রছায়ায় ভগাংশসহ ৮টি সংগঠন নিয়ে 'রেল শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ' এবং আমরা বিআরইএল, শ্রমিক দল ও জাতীয় রেল শ্রমিক পার্টির ভগাংশ এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমিতিকে সাথে নিয়ে 'রেল শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যজোট' গঠনের মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করে রেলের সমস্যা ও সম্ভাবনা সমূহ নির্ধারণ করা হয় । যা ইতোমধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনেকটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এখন প্রয়োজন পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে দ্রুত বাস্তবায়ন । তাই এ সংগঠনের প্রস্তাবসমূহ যা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনায় নেয়া হয়েছে তা আমি এখানে যৎসামান্য উল্লেখ করছি:

প্রস্তাবনা:

১. মাত্র ৬০০ মাইল রেললাইন স্থাপন করা গেলে প্রত্যেক জেলার সাথে ঢাকার রেল যোগাযোগ স্থাপিত হতে পারে ।

২. রেলের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট জাতীয় বাজেট থেকে আলাদা করতে হবে । অবশেষে সরকার ৪ ডিসেম্বর-২০১১ সালে রেলপথ মন্ত্রণালয় নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে ।

৩. মাথাভারী প্রশাসন বিলুপ্ত করে রেলওয়ে বোর্ড গঠন করতে হবে।

৪. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিং, লাইনের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত গতির ট্রেন চালানো, পরিচালনা ব্যয় ও সময় হ্রাসে ইলেকট্রিক ট্রাকশন চালু করাতে হবে।

৫. রেলকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনে রেল খাতকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় ২টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় আর্থিক বিনিয়োগ করতে হবে।

৬. 'জব এনলাইসিস' করে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে।

৭. রেলের সকল কারখানা, সেড, ডিজেল কারখানা, সিগন্যাল কারখানা সমন্বিত পরিকল্পনা এনে উৎপাদনমুখী করা।

৮. যোগ্যতা ও দক্ষতার মূল্যায়ন করে 'জব কার্ড' চালুর মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজের জন্য উৎসাহ ভাতা চালু করা।

৯. সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বিশেষে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

১০. রেল ব্যবস্থাপনাকে কম্পিটারাইজড করা।

১১. ঢাকা-চট্টগ্রামসহ সকল মেইন লাইনগুলো এক-গেজ করে ডাবল লাইন বাস্তবায়ন করা। স্বীকৃত লাকসাম-ঢাকা কর্ড রেলপথসহ দোহাজারী-কক্সবাজার, বগুড়া-যমুনা সেতু, ভৈরব-চাতিয়ান রেললাইন নির্মাণে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. কোন টালবাহানা না করে পদ্মা সেতুর শুরুতে ব্রিজের মধ্য খানে 'ডুয়েল গ্যাজে' রেল লাইনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৩. রেলভূমি দখলমুক্ত করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৪. প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রেখে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেয়া।

১৫. শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা নির্বিশেষে পেশাগত ন্যায্য স্বীকৃত অধিকার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করে একটি টিম স্পিরিটের মাধ্যমে রেল পরিচালনায় গতিবেগ সৃষ্টি করা।

পরিশেষে আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী ও দেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে বলতে পারি, কম পরিবেশ দূষণ, স্বল্প খরচ, পারিবারিক পরিবেশ নিরাপদ যাত্রা, যানযট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম, ব্যাপক মালামাল পরিবহন এর মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক, কম জ্বালানি খরচ, সর্বোপরি পরিবেশবান্ধবের কারণে পৃথিবীব্যাপী আজ রেলপথ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের জাতীয় প্রয়োজনে আমরা কেন পেছনে থাকব? তাই আমি আন্তরিক আহবান ও নিবেদন করছি; আর রেল উন্নয়নে প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবায়নই আজ দেশবাসীর কাম্য ও সময়ের দাবি।

লেখক : *কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ (বিআরইএল) প্রাক্তন সদস্য, চট্টগ্রাম ১ম লেবার কোর্ট।*

লেখা আহ্বান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৯৯২৯৫১৩৬৪, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail : sramikbarta2017@gmail.com

শ্রমিকের মানবাধিকারই শ্রম অধিকার

শাহ মু. মাহফুজুল হক

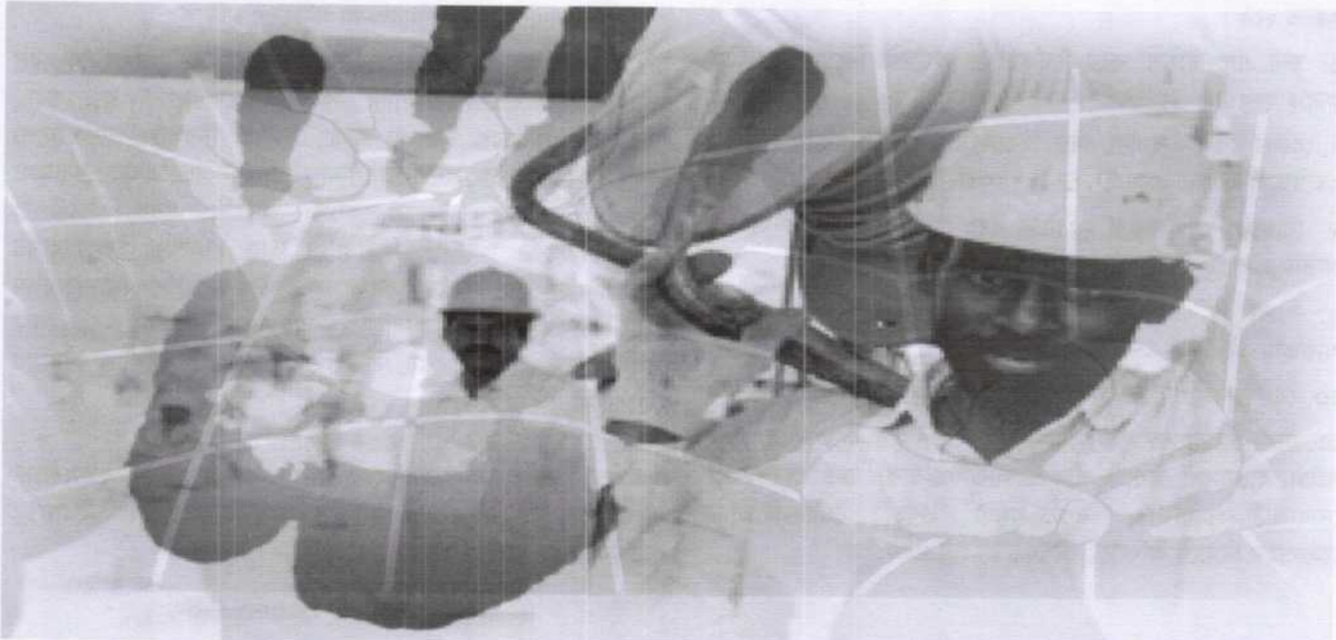

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সভ্যতার বিনির্মাণে শ্রম ও শ্রমিকের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা শ্রমিকই হলো সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা যে খাদ্যের ওপর নির্ভর করি, যে মনোরম অট্টালিকা বা গৃহে আমরা বসবাস করি, চলাচলের জন্য আমরা যে সড়ক ও পরিবহন ব্যবহার করি, আমাদের দেশের রফতানি আয়ের সিংহভাগ যে গার্মেন্টস সেক্টর থেকে আসে; এক কথায় আমাদের জীবন ধারণ, সভ্যতার বিনির্মাণ ও ক্রমবিকাশ যাদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে তারা হলেন শ্রমিক বা শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের সুফল সবাই ভোগ করলেও উপেক্ষিত থেকে যায় সেই কারিগররা। বরং অন্যদের সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে কখনো কখনো কর্মক্ষেত্রে জীবনও দিতে হয় এই শ্রমিকদেরকে। নানা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত বা পঙ্গুত্বের গ্লানি বহন করতে হয় তাদেরকে। অথচ শ্রমিকরাও আমাদের মত রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তাদেরও আছে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। আছে স্বাধীনভাবে কাজ করার ও নিজেদের অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার অধিকার। তাদেরও মনে উঁকি দেয় জীবন নিয়ে অনেক স্বপ্ন।

শ্রমিকের মানবাধিকারই শ্রম অধিকার

মানবাধিকার হলো মানুষের অধিকার। একজন মানুষের সেই সব অধিকার মানবাধিকার, যা সে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার কারণেই অর্জন করে থাকে। এই সকল অধিকার ছাড়া কোন মানবশিশু পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

মানবাধিকার বলতে মূলত ৩টি বিষয়কে নির্দেশ করে :

১. সকল প্রকার অভাব থেকে মুক্তি (খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি)

২. ভয় থেকে মুক্তি (প্রাণ হারানোর ভয়, মান সম্মান ও সম্পদ হারানোর ভয় ইত্যাদি)

৩. স্বাধীনতা (মতপ্রকাশ, সংগঠন ও সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতা ইত্যাদি)

শ্রমিক বলতে সাধারণত কায়িক শ্রমে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তিকে বুঝায়। যেমন রিকশাচালক, কুলি-মজুর, কৃষি শ্রমিক, গার্মেন্টস, কর্মীসহ অন্যান্য পেশার কায়িক শ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রম আইনের ২(৬৫) ধারা মতে 'শ্রমিক' অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তাহার চাকরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যাই থাকুক না, যিনি কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন; কিন্তু প্রধান প্রশাসনিক (তদারকি কর্মকর্তা) বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

অন্য দিকে শ্রম অধিকার বলতে শ্রমিকের অধিকারকেই বুঝায়। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে শ্রম অধিকার বলতে শ্রমিকদের সংঘ বা সমিতি করার অধিকার, দরকষাকষির মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণ ও বৃদ্ধি করার অধিকার, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, স্বাধীনভাবে কাজ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার, কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ও নারীশ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সময়ে বেতনসহ

শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের সুফল সবাই ভোগ করলেও উপেক্ষিত থেকে যায় সেই কারিগররা। বরং অন্যদের সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে কখনো কখনো কর্মক্ষেত্রে জীবনও দিতে হয় এই শ্রমিকদেরকে। নানা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত বা পঙ্গুত্বের গ্লানি বহন করতে হয় তাদেরকে। অথচ শ্রমিকরাও আমাদের মত রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তাদেরও আছে সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। আছে স্বাধীনভাবে কাজ করার ও নিজেদের অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার অধিকার। তাদেরও মনে উঁকি দেয় জীবন নিয়ে অনেক স্বপ্ন।

ছুটি পাওয়ার অধিকার প্রভৃতিকে নির্দেশ করে। আমাদের সমাজে অনেকেই বিশেষ করে মালিক শ্রেণী শ্রমিকদের এই অধিকারগুলোকে তাদের জন্য বাড়তি প্রেসার বা বোঝা মনে করেন। কিংবা এই ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদানকে শ্রমিকদের প্রতি তাদের করুণা বা অনুকম্পা প্রদর্শন মনে করে থাকেন। কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে শ্রমিক অধিকার শ্রমিকদের প্রতি সরকার বা মালিক পক্ষের কোনো করুণা নয় বরং এই অধিকারগুলো তাদের মানবাধিকার যা কোনভাবেই অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের আলোকে শ্রমিক অধিকারসমূহ :

শ্রমিকরা যেহেতু আমাদের মত মানুষ সেহেতু ১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৩০টি ধারার প্রত্যেকটি ধারায় শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে ঘোষণাপত্রের ১, ৩, ৫, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ নং ধারাসমূহকে শ্রম বা শ্রমিকের অধিকারের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঘোষণাপত্রের ১ নং ধারায় বলা হয়েছে–

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

২ নং ধারায় বলা হয়েছে,

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকে সমানভাবে ভোগ করবে।

ধারা ৩ এ বলা হয়েছে-

জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

গৃহস্থ পরিচারিকা থেকে শুরু করে শ্রমিকদের ওপর যে নির্যাতন করা হয় তা যে সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন তার উল্লেখ রয়েছে ৫ নম্বর ধারায়। যেখানে বলা হয়েছে-

কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শাস্তি দেয়া যাবে না।

ন্যায্য দাবি ও নিজেদের অধিকার আদায়ে সমাবেশ ও সংঘ বা সমিতি করার পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে ২০ নং ধারায় বলা হয়েছে–

১. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা বা অধিকার রয়েছে।

২. কাউকে কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

দেশের নাগরিক হিসাবে সরকারি চাকরি ও দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে শ্রমিকদের। এ বিষয়ে ২১ নং ধারার ২ ও ৩ নং উপধারায় বলা হয়েছে–

২. নিজ দেশের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

৩. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোনো অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

যদিও বিভিন্ন ধরনের কোটা ও অনির্বাচিত অবৈধ সরকার জোরপূর্বক ক্ষমতায় থাকায় এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সারাদেশের সকল মানুষের ন্যায় শ্রমিকরাও।

শ্রমিকদের মানবাধিকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৩ ও ২৪ নং ধারা- যেখানে শ্রমিক অধিকারের কয়েকটি বিষয় সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো-

ধারা ২৩

১. প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকরি বেছে নেয়ার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. কোনরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

৩. কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনবোধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

৪. নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে। যদিও আমাদের দেশে গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদেরকে এখনো বিভিন্ন অজুহাতে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যা সরাসরি মানবাধিকার তথা শ্রম অধিকারের লঙ্ঘন।

ধারা ২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে; নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতনসহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আহত, পঙ্গুত্ব, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোন কারণে উপার্জনে অক্ষম হলে সামাজিক নিরাপত্তা প্রোগ্রামের আওতায় রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়া শ্রমিকের মানবাধিকার।

UDHR এর ২৫ নং ধারায় এর ব্যাপারে বলা হয়েছে-

১. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদির সুযোগ এবং এ সঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্য কারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. মাতৃত্ব এবং শৈশবাবস্থায় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। বিবাহবন্ধন-বহির্ভূত কিংবা বিবাহবন্ধনজাত সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

অন্যান্য মানুষদের ন্যায় শ্রমিকদের ও তাদের সন্তানদের শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা এসেছে ২৬ নং ধারায়, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে-

১. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্তত পক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

২. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা-সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গোত্র এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস পাবে এবং শান্তিরক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের কার্যাবলিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩. কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেয়া হবে, তা বেছে নেয়ার পূর্বাধিকার পিতা-মাতার থাকবে।

উল্লেখিত অধিকারের পাশাপাশি অন্য সকলের ন্যায় শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে ধারা ২৯ ও ৩০ এ-

১. প্রত্যেকেরই সে সমাজের প্রতি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে, যে সমাজেই কেবল তার আপন ব্যক্তিত্বের স্বাধীন এবং পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

২. আপন স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহ ভোগ করার সময় প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন যা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নৈতিকতা, গণশৃংখলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায়ানুগ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আইন দ্বারা নির্ণীত হবে।

৩. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কোন উপায়ে এ অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করা যাবে না।

উল্লেখিত অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা দিয়ে সনদের ৩০ নং তথা সর্বশেষ ধারায় বলা হয়েছে- কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এ ঘোষণাপত্রের কোন কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার বলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাৎ করতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের কোন কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

অধিকার সমূহের বাস্তবায়ন :

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী জনগণের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি রাষ্ট্রের কিছু বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব রয়েছে। আর তা হচ্ছে

১. শ্রদ্ধা করার বাধ্যবাধকতা: জনগণের প্রাপ্য অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এমন কিছু করবে না যাতে জনগণের অধিকার কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা: কেউ যদি রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের অধিকার ভোগে বাধা প্রদান করে রাষ্ট্র সেই বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থেকে নাগরিকের অধিকারকে সুরক্ষা দিবে।

৩. পরিপূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা: রাষ্ট্রের নাগরিকেরা যেন তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলোকে ভোগ করতে পারে সেজন্য এই অধিকারগুলোকে সহজলভ্য ও উন্নততর করার ব্যবস্থা করবে।

সুতরাং শ্রমিকদের উপরোক্ত অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা রাষ্ট্র তথা সরকারের জন্য একান্ত জরুরি।

শ্রম অধিকার

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল তথা UDHR এ উল্লেখিত শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ঘোষণা করেছে International Labour Standard বা আন্তর্জাতিক শ্রম মান। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকরা যেন আত্মমর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারে সে জন্য আইএলও মোটা দাগে ৫টি বিষয়কে আন্তর্জাতিক শ্রম মান (International Labour Standard) হিসেবে ঘোষণা করে। তাই শ্রমমান হচ্ছে শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার বা শ্রমধিকার।

আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুযায়ী বাংলাদেশের আইনে শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারসমূহ :

শ্রম অধিকার বা শ্রমিকদের অধিকার হচ্ছে শ্রম ও নিয়োগ আইনের অধীনস্থ একটি আইন, যেখানে শ্রমিকদের অধিকার এবং শ্রমিক ও তাদের নিয়োগকারীদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। সাধারণত এই আইন শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কর্মস্থলে সকল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ রাখাই হচ্ছে এই আইনগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য।

সংঘ বা সমিতির স্বাধীনতা : শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য স্বাধীনভাবে সমিতি বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো হবে সম্পূর্ণরূপে তাদের নিয়োগকর্তাদের এবং সরকারের প্রভাবমুক্ত। বাংলাদেশের শ্রম আইন-২০১৮ অনুযায়ী কোনও কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ২০ শতাংশের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। শ্রমিক সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন ৫৫ দিনের মধ্যে করতে হবে।

যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার : শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ে সম্মিলিতভাবে বা পৃথকভাবে নিয়োগকারীদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণে যেকোনও

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিক এই ত্রিপক্ষীয় পরিষদ করার বিধান রাখা হয়েছে।

জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধকরণ : সকল প্রকার জোরপূর্বক শ্রম বা দাসত্ব থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তা রয়েছে এবং এমনকি জেলখানাতেও শ্রমিকদের দ্বারা জোরপূর্বক কোন কাজ করানো যাবে না। বাংলাদেশের শ্রম আইনে একই ধরনের বিধান রাখা হয়েছে।

শিশুশ্রম দূরীকরণ : শিশুদের জন্য কাজ করার একটি ন্যূনতম বয়স এবং নির্দিষ্ট শর্তের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের বর্তমান শ্রম আইন অনুযায়ী ১৪ বছর বয়সের নিচে কোনও শিশুকে কোনও কারখানায় নিয়োগ দেয়া যাবে না। ১৪ বছরের নিচে কাউকে নিয়োগ দেয়া হলে মালিকের ৫ হাজার টাকা জরিমারা হবে।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা : সমান কাজের জন্য সবাই সমান বেতন পাবে। ধর্ম, বর্ণ কিংবা লিঙ্গ ভেদে কোন ধরনের বৈষম্য বা বিভাজন করা যাবে না।

বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানায় নারীশ্রমিকরা ৮ সপ্তাহের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। এর ব্যত্যয় হলে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। কোনও নারীশ্রমিক সন্তান সম্ভবা হলে তার প্রমাণ পেশ করার ৩ দিনের মধ্যে ছুটি দিতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় কোনও শ্রমিক মারা গেলে দুই লাখ টাকা এবং দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে পড়লে আড়াই লাখ টাকা শ্রমিককে দিতে হবে।

৫১ শতাংশ শ্রমিকের অনুমতি সাপেক্ষে ধর্মঘট করা যাবে। যেকোনও শ্রম আদালতে ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। না হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। এই ১৮০ দিনের মধ্যেও যদি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে।

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ভূমিকা:

রাষ্ট্রপক্ষ, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার বা মানবাধিকার সুনিশ্চিত ও সুরক্ষায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংগঠন হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation)।

শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও তাদের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যা সংক্ষেপে আইএলও (ILO) নামে পরিচিত। ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১৯ই এপ্রিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রায় ১ বছর পর ১৯৪৬ সালে এই সংস্থা জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ। সংস্থার সদর দফতর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। এ ছাড়া ৪০টি দেশে এর স্থানীয় অফিস রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গঠন:

শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কিভাবে কাজ করে তা সম্পর্কে জানতে হলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গঠন সম্পর্কে জানা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি ত্রি-পক্ষীয় কাঠামো রয়েছে। এই সংস্থাটির যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনা সরকারের প্রতিনিধি, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি ও শ্রমিকদের প্রতিনিধির সমন্বিত ভূমিকার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক/শ্রম সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই সম্মেলন প্রতি বছর একবার অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক শ্রমনীতির কোন পয়েন্ট সংযোজন কিংবা বিয়োজন, সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট অনুমোদন হয়ে থাকে। সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময় শ্রম (ILO) সংস্থাটি পরিচালিত হয় একটি গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে। ILO এর গভর্নিং বডিটি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্য থেকে ২৮ জন সরকারি প্রতিনিধি, ১৪ জন মালিক (Employer) পক্ষের প্রতিনিধি ও ১৪ জন শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বর্তমান ডাইরেক্টর জেনারেল বা প্রধান পরিচালক হলেন গে রাইডার (GAY Ryder) এই সংস্থাটি ১৯৮৯ সালে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় অনন্য অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশে ও এই সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ ও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম আদর্শ (International Labour Standard) নামে নৈতিক ও আইনি কাঠমো তৈরি করছে যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে মেনে চলতে হয়। অবশ্যই এক্ষেত্রে ২ ধরনের বিষয় রয়েছে:

১. চুক্তি (Conventions) যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত এবং তা মানতে বাধ্য।

২. সুপারিশ (Recommendations) যা অনুমোদন ও মানার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই Convention ও Recommendation সমূহ সাধারণত International Labour Conference এ গৃহীত হয়।

আন্ততর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক গৃহীত মৌলিক Convention সমূহ:

ILO এখন পর্যন্ত সর্বমোট ১৮৫টি Convention, ২০৩টি Recommendations ও ৬টি Protocol তৈরি করছে।

এর মধ্যে ৮টি Convention কে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা তাদের মৌলিক Convention বা চুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

এই ৮টি মৌলিক Convention হলো:

1. Freedom of Associations and Protection of the Rights to Organise Convention, 1948
2. Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
3. Forced Labour Convention, 1930
4. Abolition of forced labour Convention, 1957
5. Minimum Age Convention, 1973
6. Worst forms of Child Labour Convention,1999
7. Equal Recommendation Convention, 1951
8. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

কর্মক্ষেত্রে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ ও শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত এই ৮টি মৌলিক Convention এর বিষয়গুলো সমন্বয় করে এই শ্রম সংস্থাটি ১৯৯৮ সালে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করেছে যা ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. যদিও প্রয়োজনীয় সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদন না পাওয়ায়

(প্রয়োজনের তুলনায় অনুমোদন পেয়েছে ৯১.৭%) এই ঘোষণাটি এখনো কার্যকর হয়নি।

এই ৮টি মৌলিক Convention এর পাশাপাশি সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সহজে গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করতে ৪টি কনভেনশনকে নিয়ে Governance (Priority) Convention তৈরি করা হয়েছে।

এগুলো হলো :

1. Labour Inspection Convention, 1947
2. Labour Inspection Convention, 1949
3. Tripatriate Consultation (Agriculture Convention), 1976
4. Emplozment Policy Convention, 1964

GB 8টি Convention এর বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ঘোষণা করা হয়েছে ILO Declaration on Social Justice for a fair globalization.

শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও শ্রমিক দিবস

বাংলায় বহুল প্রচলিত একটি কথা হচ্ছে অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। মানবাধিকার সনদ, শ্রম মান কিংবা শ্রম আইনে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা কিংবা ধারা উপধারা থাকলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। তবে যতটুকু অধিকার এখন শ্রমিকরা পাচ্ছে তার পেছনেও রয়েছে তাদের দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাস।

শ্রমিকের অধিকার নিয়ে যুগে যুগে অনেকে কাজ করলেও পৃথিবীতে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। কেননা তার নবুয়্যত লাভের পূর্বে শ্রমিকদের কোন অধিকারই ছিল না, ছিল না সামাজিক কোন মর্যাদা। এমনকি তাদেরকে মানুষই মনে করা হতো না। বরং পশুর মত তাদেরকে বাজারে বিক্রি করা হতো। আর যারা তাদেরকে কিনে নিতো তারা এই দাস বা গোলামদেরকে হাল চাষ ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুর মতো ব্যবহার করত এবং বিভিন্ন অজুহাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো। ইসলামের অমিয় বাণী 'সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই' এই ঘোষণার মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শ্রমিকদেরকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেটে খাওয়া মানুষের মর্যাদা বর্ণনা করে ঘোষণা করেন, আল-কাসিবু হাবিবুল্লাহ্ অর্থাৎ "শ্রমিক হলো আল্লাহর বন্ধু" (কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১২৭)। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ঐ যুগে বিভিন্ন অজুহাতে শ্রমিকদেরকে তাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হতো। তাই রাসূল (সা) চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিককে যথাসময়ে পূর্ণ বেতন পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, ত্বরিত মজুরি পরিশোধের তাকিদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "শ্রমিকের পারিশ্রমিক বা মজুরি তার ঘাম শুকানোর পূর্বে দিয়ে দাও।" (সুনানু ইবন মাজাহ্) নবী করীম (সা) আরও বলেন, "তিন ধরনের ব্যক্তি আছে কিয়ামতের দিন আমি যাদের দুশমন হবো। আর আমি যাদের দুশমন হবো তাকে আমি লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে ছাড়ব। উক্ত তিনজনের মধ্যে একজন সে যে কোনো শ্রমিককে খাটিয়ে নিজের কাজ পুরোপুরি আদায় করে নেয়। কিন্তু তার উচিত মজুরি প্রদান করে না।" (সহিহুল বুখারি)। যে ব্যক্তি যত বেশি পরিশ্রমী সে ব্যক্তি ততবেশি সফল, একইভাবে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রম আল্লাহ্ প্রদত্ত মানবজাতির জন্য এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। এ সম্পর্কে আল- কোরআনে বর্ণিত আছে, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।" (সুরা বালাদ)

সভ্যতা বিনির্মাণে শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস যদিও অনেক প্রাচীন তবে আধুনিক যুগে শ্রমিকদের অধিকার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সুসংগঠিতভাবে শুরু হয় ১৮০০ সালের শুরু থেকে। ১৮০৬ সাল পর্যন্ত কল কারখানায় ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল কর্মদিবস। ১৮২০-১৮৪০ পর্যন্ত অনেক আন্দোলন ও ধর্মঘটের পর ১০ ঘণ্টা কর্মদিবস হিসেবে স্বীকৃত পায়। ১৮৬১ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার। ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর এই সংগঠনটির ৪র্থ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘণ্টাকেই কাজের দিন হিসেবে

"শ্রমিকের অধিকার নিয়ে যুগে যুগে অনেকে কাজ করলেও পৃথিবীতে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। কেননা তার নবুয়্যত লাভের পূর্বে শ্রমিকদের কোন অধিকারই ছিল না, ছিল না সামাজিক কোন মর্যাদা। এমনকি তাদেরকে মানুষই মনে করা হতো না। বরং পশুর মত তাদেরকে বাজারে বিক্রি করা হতো। আর যারা তাদেরকে কিনে নিতো তারা এই দাস বা গোলামদেরকে হাল চাষ ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুর মতো ব্যবহার করত এবং বিভিন্ন অজুহাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো। ইসলামের অমিয় বাণী 'সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই' এই ঘোষণার মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শ্রমিকদেরকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করলেন।"

আইনগত স্বীকৃতি আদায়ের। ১৮৮৫ সালে ব্যাপকতর হলো এই আন্দোলন। শুরু হলো শ্রমিক বিক্ষোভ ও ধর্মঘট। শ্রমিকরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৮ ঘন্টার বেশি কাজ না করার। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৮৮৬ সালের ১লা মে ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে ধর্মঘটে যোগ দেয়। ৩রা মে ম্যাককর্মিক হার্ভেস্টার কারখানায় পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয়। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৮৮৬ সালের ৪ মে শ্রমিকরা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের বাণিজ্যিক এলাকা 'হে মার্কেটের সামনে জড়ো হয়। সেদিন আন্দোলনরত শ্রমিকদের ঘিরে থাকা পুলিশদের প্রতি এক অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি কর্তৃক বোমা নিক্ষপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। এতে ৮ জন পুলিশ ও অসংখ্য শ্রমিক নিহত হয়। এই ঘটনার জন্য শাসকগোষ্ঠী শ্রমিক নেতাদেরকে দায়ী করে এবং প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ৪ জন শ্রমিক নেতাকে ফাঁসি দেয়। এই চারজন হলেন আগস্ট স্পাইজ, পার্সনস, ফিসার ও এঞ্জেল। চারদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ধ্বনিত হলো ধিক্কার, নিন্দা আর শ্রমিকদের প্রতিবাদের আওয়াজ। এরই ধারাবাহিকতায় অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ১৮৮৯ সালের ৪ জুলাই ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর মে মাসের ১ তারিখকে 'বিশ্ব শ্রম দিবস' বা 'বিশ্ব শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ঘোষণা অনুযায়ী আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৮৯০ সালের ১লা মে প্রথম আন্তর্জাতিক মে দিবস হিসেবে পালিত হয় ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে ১লা মে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। প্রতি বছর এই দিবসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা, সেমিনারসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে একধরনের সচেতনতা তৈরি হয়। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রথম দিকে শ্রম আন্দোলন শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলন কর্মঘণ্টা আরও কমানোর পাশাপাশি ওভারটাইমের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিসহ শ্রমিকদের আরও কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রমিকদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিশুশ্রম দ্বারা তৈরিকৃত পণ্য বর্জন, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, যাতায়াত, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি। তা ছাড়া ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজের সমান সুযোগ ও সমান মজুরি নিশ্চিত করাও শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলো তাদের কর্মসূচি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকে।

শ্রম অধিকার ও তার বাস্তবায়ন:

যে চেতনাকে ধারণ করে বিশ্বব্যাপী '১লা মে বিশ্ব শ্রমিক দিবস' পালিত হয় বাস্তবে তার প্রতিফলন খুব কমই দেখা যায়। দেশে দেশে শ্রমিক শোষণ, নিপীড়ন আজও চলছে। অনেক দেশেই শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ৪ঠা নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বর্তমানে ১০ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করেও বিশ্বের ৮০ ভাগ শ্রমিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। ১.২ বিলিয়ন শ্রমিকের আয় ১ ডলার ৫০ সেন্টের নিচে। ৭৫ ভাগ শ্রমিকের কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই। নানা অজুহাতে ২০২ মিলিয়ন শ্রমিক ২০১৩ সালে চাকরিচ্যুত হয় যা ২০১২ সাল থেকে ৫ মিলিয়ন বেশি।

বাংলাদেশেও মে দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়ে আসছে কিন্তু এ কথাও সত্য যে স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ তেমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বিশেষ করে যে মূল দাবিকে কেন্দ্র করে মে দিবসের ঘটনা ঘটেছিল সেই ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার আজও সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১৭ সালের ৩০ শে এপ্রিল বাংলাদেশ লেবার স্টাডিজ (বিলস) কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি-২০১৬ এর প্রতিবেদনে দেখা যায় পরিবহন শ্রমিকের শতকরা ১০০ ভাগ লোক দৈনিক ৮ ঘণ্টার ওপর কাজ করে থাকেন। এ ছাড়া হোটেলে ৯৮ ভাগ, হাসপাতালে ৪২ ভাগ ও নিরাপত্তা কর্মীদের ৮০ ভাগ শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টার ওপর কাজ করে। উক্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তাদের অপর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে ২৮ জন নারীসহ ৬৯৯ জন শ্রমিক নিহত ও ৭০৩ জন আহত হয়। অন্য দিকে শ্রম অসন্তোষ ও শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে ২৩৭টি, সহিংসতায় নিহত হয় ১৮৯ জন এবং আহত হয় ৩৯০ জন শ্রমিক। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মালিক পক্ষ শ্রম আইন বা সরকারি কোন নির্দেশনা মানেন না। নারীশ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, গ্র্যাচুয়িটি, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ইত্যাদি আইনে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে অনেক প্রতিষ্ঠানে এ সবের প্রয়োগ নেই। অস্বাস্থ্যকর ও অনুন্নত কর্মপরিবেশ, নানা অজুহাতে শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি কর্তন, হয়রানি, যৌন নিপীড়ন তো চলছেই।

কাজেই বলা যায়, আমাদের দেশে শ্রম অধিকার তথা শ্রমিকদের মানবাধিকার আজও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। কেননা শ্রমিকরা যদি তাদের ন্যায্য মজুরি পায়, কর্মনিরাপত্তা ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা পায় তাহলে একদিকে যেমন শ্রমিক অসন্তোষ কমবে, তেমনি উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে, গতিশীল হবে দেশের অর্থনীতির চাকা। যার সুফল সবাই ভোগ করবে। তাই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা জরুরি। এ ব্যাপারে সরকার, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রম অধিকারকে শ্রমিকদের প্রতি করুণা হিসেবে না দেখে একে তাদের মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা) অসন্তুষ্ট হবেন এই অনুভূতি নিয়ে শ্রমিকের অধিকার আদায় করতে হবে। তবেই শ্রম অধিকার ঘোষণা ও শ্রম দিবস পালন সার্থক হবে।

লেখক : বিশিষ্ট মানবাধিকার সংগঠক ও গবেষক

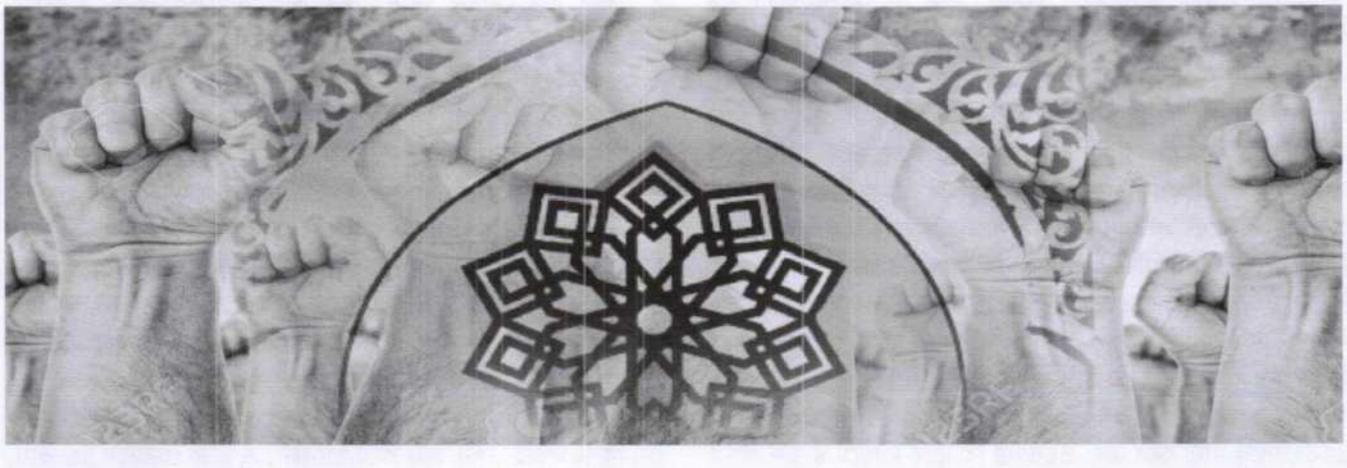

শ্রমিক আন্দোলন ও ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন

লস্কর মো: তসলিম

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, আশরাফুল মাখলুকাত, মানুষের রূহসমূহকে আল্লাহ তায়ালা একসাথে সৃষ্টি করেছেন, আবার শেষ বিচারের দিন একত্রিত করবেন। আল্লাহর ব্যবস্থাপনার মধ্যে সাম্য ন্যায় ইনসাফের শিক্ষা থাকলেও মানুষ তা লজ্ঘন করে থাকে, মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষ সবসময় একে অপরের উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করতে চেয়েছে এবং করে চলছে।

কর্মের প্রয়োজনেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সৃষ্টি হয়েছে, এখনো হচ্ছে। সমাজের কর্তৃত্বশীল মানুষগুলোর মানবিক দুর্বলতার কারণে শোষণ জুলুম করে সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়তই দাসে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে। ফলে বিশ্ব মানবেতিহাসে ইসলামের অনুপস্থিতিতে প্রথমে চলে দাসপ্রথা তারপর তৈরি হয় পুঁজিবাদ। এর বিপরীতে বঞ্চিত নিপীড়িত মজলুম শ্রেণীর মানুষগুলো তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যখন সক্রিয় হয়েছে, তখন সমাজতান্ত্রিক সর্বহারা শ্রেণী এসে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার নামে শ্রমিকদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে।

শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

সুদীর্ঘ শত শত বছরের বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত চিত্র হচ্ছে :

১৮২৭ সালে পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে খ্যাত 'মেকানিকস ইউনিয়ন অফ ফিলাডেলফিয়া, (Mechanics Union of Philadelphia). ১৮৩৪ সালের নিউইয়র্কে বেকারি শ্রমিকদের ধর্মঘট, ১৮৩৭ সালে ১০ ঘণ্টা কর্মদিবসের আন্দোলন, ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবিতে আন্দোলন, ১৮৭৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলন, ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ শ্রমিকের প্রাণ দান, ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে ৪ঠা মে এর আন্দোলন, ১৮৮৭ সালে শ্রমিক নেতাদের ফাঁসি, ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাইয়ের প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে ১লা মে শ্রমিক দিবস ঘোষণা, ১৮৯০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের হাইড পার্কে শ্রমিক দিবস পালন। ভারত উপমহাদেশে মে দিবস পালন হয় ১৯২৩ সালে মাদ্রাজ থেকে।

এতদঞ্চলে শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে আস্তিক তথা আল্লাহ বিশ্বাসী হলেও শ্রমিক আন্দোলন তথা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে রয়েছে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীরা। আমাদের বাংলাদেশের নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ৯৫%ই ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী আদর্শের। ইসলামপন্থীদের কাজ শুরু হয় ১৯৬৫ সাল থেকে। নিবন্ধিতরূপ লাভ করে ১৯৬৮ সালে।

ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন

আমরা যারা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখতে চাই, দ্বীন কায়েমের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই তাদেরকে বিবেক বুদ্ধির চোখ মেলিয়া সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে যে প্রতিটি মানুষকে মহান আল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্নতা শ্রমিক বানিয়েছেন তথা শ্রমিক বানিয়েছেন। এখানে অহংবোধকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ নবী রাসূলগণ বিভিন্ন শ্রমপেশার শ্রমিক ছিলেন। পিতা হযরত আদম (আ) কৃষি শ্রমিক, হযরত নূহ (আ) সুতার শ্রমিক, হযরত ইদ্রিস (আ) তাঁত শ্রমিক, হযরত দাউদ (আ) কর্মকার, হযরত মূসা (আ) মেষচালক, রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন পশু শ্রমিক, তাঁর আশপাশে (দাস) শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্বপূর্ণ অবস্থান ও আধিক্য ছিল। ইসলামের ইতিহাসে শ্রমজীবী মানুষ ও গোলামকে সমাজের মানুষ ভাই হিসাবে গ্রহণ করেছিল। শ্রমজীবী হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা) কে খলিফা, বেলাল (রা) মদীনা মসজিদের মুয়াজ্জিন, যায়েদ ও ওসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার ইচ্ছা হয় তোমাদের মধ্যে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছে তাদের সাহায্য করি তাদের নেতা নির্বাচন করি তাদেরকে উত্তরাধিকারী এবং শাসনক্ষমতা দান করি।' (সূরা কাসাস : ৬) তাই শ্রমজীবী ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদেরকে দ্বীন কায়েমের কাজে সংগঠিত করার পরিকল্পনা বাস্তবতার দাবি। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন করে শ্রমিকদের দ্বীনের কাজে আহবান জানাতে হবে, সংগঠিত করতে হবে, অধিকার আদায় করতে হবে। 'রাসূলে করিম (সা) শ্রমিকের হাতকে চুমু খেয়েছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ করে দিতে বলেছেন, মজুরি নির্ধারণ করে নিতে বলেছেন, সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপাতে নিষেধ করেছেন, খাওয়া পরার ক্ষেত্রে পার্থক্য করতে নিষেধ করেছেন।

আমরা যারা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখতে চাই, দ্বীন কায়েমের কাজের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই তাদেরকে বিবেক বুদ্ধির চোখ মেলিয়া সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে যে প্রতিটি মানুষকে মহান আল্লাহ ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্নতা শ্রমিক বানিয়েছেন তথা শ্রমিক বানিয়েছেন। এখানে অহংবোধকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ নবী রাসূলগণ বিভিন্ন শ্রমপেশার শ্রমিক ছিলেন। পিতা হযরত আদম (আ) কৃষি শ্রমিক, হযরত নূহ (আ) সুতার শ্রমিক, হযরত ইদ্রিস (আ) তাঁত শ্রমিক, হযরত দাউদ (আ) কর্মকার, হযরত মূসা (আ) মেষচালক, রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন পশু শ্রমিক, তাঁর আশপাশে (দাস) শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্বপূর্ণ অবস্থান ও আধিক্য ছিল। ইসলামের ইতিহাসে শ্রমজীবী মানুষ ও গোলামকে সমাজের মানুষ ভাই হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

তাই দক্ষ-অদক্ষ সকল শ্রমিকের প্রকৃত নিড (চাহিদা) আমাদের বুঝতে হবে, বুঝাতে হবে, সেই আলোকে যৌক্তিক বেতন কাঠামো মজুরির প্রস্তাবনা প্রস্তুত করতে হবে, প্রচলিত বৈষম্যযুক্ত বেতন কাঠামো ও মজুরির ত্রুটিসমূহ তুলে ধরে শ্রমিকদের সচেতন করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে বৈষম্যহীন ইনসাফপূর্ণ আদর্শ শ্রমনীতির পক্ষে। নিজেদের মধ্যে নিজেদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শ্রমনীতির উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমাদের ভাবতে হবে:

'লিমা তাকু-লু-না মা-লা- তাফআলুন' থেকে বাঁচতে হবে। শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকের মর্যাদা, শ্রমিক সমস্যা সমাধানে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সময়োপযোগী কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ইসলাম অনুসারীদের জন্য খুবই জরুরি ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে ইসলামী শ্রমনীতির দাওয়াত শ্রমিকদের নিকট পৌছানো। চলমান বিশ্বব্যবস্থায় অগণিত কর্ম পেশার ট্রেড ইউনিয়নকে অগ্রাহ্য করে অবহেলা করে ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী করা অসম্ভব। আমাদের ভাবতে হবে শ্রমিকরাও আমাদের ভাই বোন তাদেরকেও জান্নাতে যাওয়ার অধিকার আছে, 'কু আন ফুসাকুম ওয়া আহলিকুম না-রা'। ট্রেড ইউনিয়ন করে তাদেরকে সংগঠিতভাবে সাধারণ দাওয়াত, ভালোবাসা, মনজয়ের আওতায় আনতে চেষ্টা করতে হবে, আল কোরআনের ভাষায় 'উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি, ওয়াল মাওয়িজাতিল হাসানা' তোমরা রবের পথে মানুষকে ডাকো কৌশল ও সুন্দর কথার মাধ্যমে। আমাদেরকে জান্নাতের পথে শ্রমিকদের ডাকতে হবে, কৌশল করে ডাকতে হবে, সুন্দর কর্মকৌশলের মাধ্যমে ডাকতে হবে, অন্যথায় দুর্বলতা অবহেলার জন্য আখেরে আল্লাহর কাছে সকল দায়িত্ববান দায়ী সংগঠকদের জবাব দিতে হবে।

শ্রমিক সংগঠক তথা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে, সেই আলোকে সংগঠক বাছাই করতে হবে, দক্ষ সংগঠকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মনোযোগী করে দিতে হবে, উদীয়মান সামাজিক সংগঠকদের প্রশিক্ষণ মাঠ হবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, শ্রমিক কার্যক্রমকে কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে আলোচনা বক্তব্য লেখনী বাড়াতে হবে, পরিকল্পনা ও পর্যালোচনায় ট্রেড ইউনিয়ন বিষয় থাকতে হবে।

সকল শ্রমিকদের কাছে তাদের পেশার সমস্যা সমূহের কথা তুলে ধরতে হবে, আলোচনা করে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত পারিবারিক আর্থিক সমস্যাসমূহ জানতে চেষ্টা করতে হবে, সাধ্যমত সহায়তা করতে চেষ্টা করতে হবে শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি নিতে হবে। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়ম তান্ত্রিকভাবে সরকার নির্ধারিত 'ডি-ফরম' (ডিক্লেয়ারেশন ফরম) পূরণ করে নিবন্ধিত শ্রমিক হয়ে শ্রমিক অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। যত কর্ম পেশা তত ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে। আদর্শিক বিজয় অর্জন ও সংহত করতে জাতীয়, বিভাগীয়, মহানগরী, জেলা, অঞ্চল, থানা/উপজেলা, পর্যায়ে ফেডারেশন/ ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি শ্রমিক ভাইবোনদের নৈতিক আদর্শিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ ও জাতির গণতান্ত্রিক নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে ওয়ার্ড, কেন্দ্র পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়নের ইউনিট কায়েম করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিট বলতে নির্দিষ্ট পেশার শ্রমিক জনশক্তি নিয়ে গঠিত ইউনিটকেই বুঝতে হবে, অসংখ্য পেশার অসংখ্য ইউনিট করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা তত্ত্বাবধান অব্যাহত রাখতে হবে।

আমাদের দেখতে হবে পেশাভিত্তিক শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ চলছে কিনা, সংগঠিত শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় মানবিক সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে কিনা, শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি কি না 'শ্রমিক মালিক ভাই ভাই আলোচনা সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাই'

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হিসাবে আমাদেরকে এই শ্লোগান শ্রমিক অঙ্গনে চালু করতে হবে।

সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, দেশের গার্মেন্টস শিল্পের বেশি সংখ্যক শ্রমিকই মহিলা, মহিলা শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে, পরিকল্পিতভাবে কেন্দ্র, বিভাগ, মহানগরী, জেলা, থানা, উপজেলাসহ সকল পর্যায়ে মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক নিয়োগ দিতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রচলিত শ্রম আইন ও ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী মহিলা শ্রমিকের মর্যাদা সমমজুরিসহ সকল সুযোগ সুবিধা আদায়ে ভূমিকা রাখতে হবে। আসুন শ্রমিকদের মর্যাদাহীন অসহায় মনে করার স্থুলচিন্তা পরিহার করি, অধিকার আদায়ে সময়োপযোগী দূরদর্শী গঠনমূলক চিন্তা করি, বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করি, প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। 'ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাওনা ইনকুনতুম মুমিনিন'।

লেখক : *কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন*

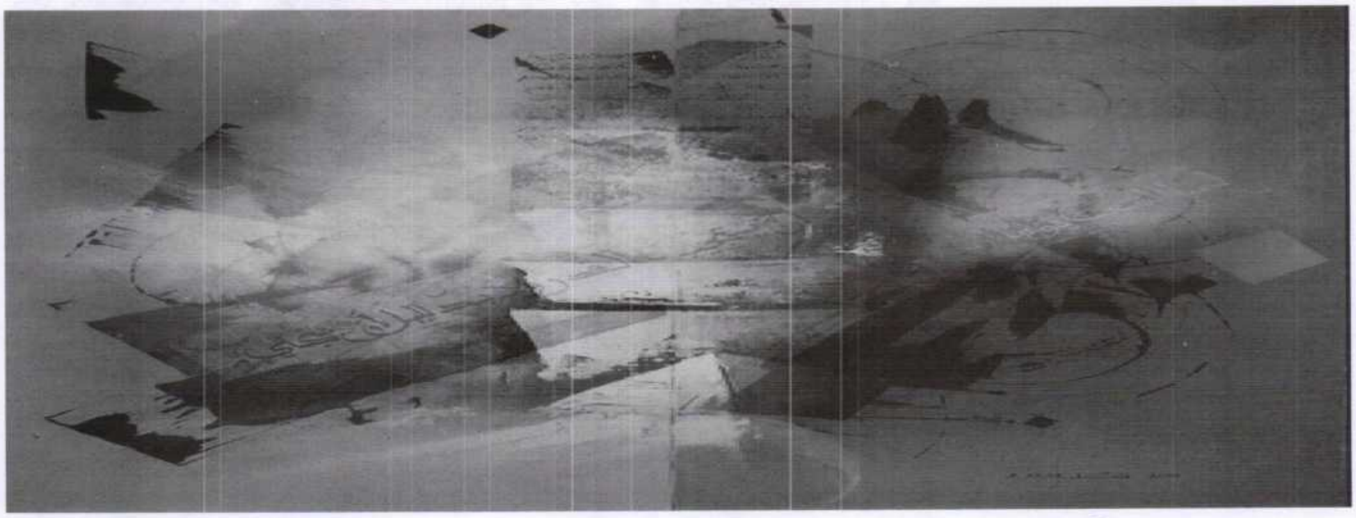

ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারণ ও মজবুতীকরণ : পদ্ধতি ও কৌশল

আতিকুর রহমান

ট্রেড ইউনিয়ন কাকে বলে?

শ্রমিক-মালিক, শ্রমিক-শ্রমিক, মালিক-মালিক এর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত যে সংগঠন, তা হলো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।

কোন নির্দিষ্ট শ্রমপেশার শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষায় গঠিত নিবন্ধিত সংগঠন হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ৪ ধরনের

১. বেসিক ইউনিয়ন।

বেসিক ইউনিয়ন ২ ধরনের

ক) প্রাতিষ্ঠানিক

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক/প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ।

২. পেশাভিত্তিক ফেডারেশন/ ক্রাফট ফেডারেশন। একই প্রকারের শিল্পে বা পেশায় কমপক্ষে ৫টি বেসিক ইউনিয়ন মিলে পেশাভিত্তিক ফেডারেশন গঠিত হয়।

৩. জাতীয় ফেডারেশন: বিভিন্ন পেশার ২০ বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে জাতীয় ফেডারেশন বলা হয়।

৪. কনফেডারেশন: ১০টি জাতীয় ফেডারেশনের সমন্বয়ে কনফেডারেশন গঠিত হয়।

ট্রেড ইউনিয়নের গঠনের উদ্দেশ্য

ট্রেড ইউনিয়নকে নির্দিষ্ট করে শ্রমিকদের জন্য ২টি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ক) শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা/সুবিধা প্রাপ্তি:

চাকরির নিরাপত্তা : নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র আদায়, কর্মঘন্টা, কাজের পরিবেশ তৈরি, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট, বেতন ও ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন।

শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা, দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা পালন।

খ) সামাজিক নিরাপত্তা :

কর্মীর নৈতিক উন্নতি সাধন, অসামাজিক কর্মঘন্টা থেকে বিরত রাখা, শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়া, বিয়ে-শাদি দেয়া, প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেয়া।

এ ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর মানোন্নয়ন, শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করা, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, শ্রমিকদের অভাব পূরণ করা কিংবা আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করা, শ্রম অঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি, মতামত দেয়া, পরামর্শ দেয়ার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি, শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও শ্রমিক মানসম্মত মজুরি নিশ্চিত করাও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শ্রমিক অধিকার লংঘনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা:

ট্রেড ইউনিয়ন হলো মূলত শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত একটি আইনস্বীকৃত সংগঠন যেটি শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায়, জীবনামান উন্নয়নে, জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও ট্রেড ইউনিয়ন সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের মনে বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং মালিকপক্ষের যাবতীয় অন্যায় আচরণ ও বিরূপ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে সাহায্য করে। বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমিকদের দুর্বল মনোবল, চাকরি হারানোর আশঙ্কা, মালিকের স্বেচ্ছাচারী আচরণের কারণে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়, মানুষ হিসাবে তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করে। শ্রমিকের মজুরি, ছুটি, বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি, পেনশন, ক্ষতিপূরণ, ওভারটাইম, বকেয়াসহ চুক্তিভিত্তিক ও আইনসঙ্গত সকল প্রাপ্য আদায়, শ্রমিকের জন্য শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ শ্রমিককে সাংগঠনিক ও আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ বলতে যা বুঝায়:

১. তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ অর্থাৎ ট্রেডভিত্তিক শিল্প, কল-কারখানা গ্যারেজ, স্ট্যান্ড, প্রতিষ্ঠান, সংস্থার

মাঝে টেড ইউনিয়ন কাজের বিস্তৃতি।

২. সকল পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং "যত ট্রেড তত ইউনিয়ন" এই শ্লোগানকে ধারণ করে সকল ট্রেডভিত্তিক একক ইউনিট গঠন এবং এর মাধ্যমে ওয়ার্ড, থানা শাখা বৃদ্ধি করে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে সম্প্রসারিত করা।

৩. সকল পেশা/ট্রেডের শ্রমিকদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি এবং আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার পরিবেশ তৈরি করা।

সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া:

১. পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
২. নেতৃত্ব তৈরি ও দক্ষতা বৃদ্ধি
৩. আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয় দিক: যেকোনো পরিকল্পনা গ্রহণে SMART টেকনিক ব্যবহার অতীব কার্যকর। ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারণেও এ পদ্ধতিকে সামনে রাখা প্রয়োজন।

S=Specific বা সুনির্দিষ্ট,
M=Measurable বা পরিমাপ যোগ্য,
A=Achievable বা অর্জন যোগ্য,
R=Realistic বা বাস্তবধর্মী,
T=Timeframe বা সময় কাঠামো

এ টেকনিককে সামনে রেখে ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

১. প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করার মত অবস্থা তৈরি হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান/ফ্যাক্টরি চিহ্নিত করা।

২. অপ্রাতিষ্ঠানিক/ প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে এমন উপজেলা/ থানা ও পেশা চিহ্নিত করা।

৩. টার্গেটকৃত পেশার সম্ভাব্য শ্রমিক সংখ্যা জানা।

৪. যাদেরকে নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করা হবে সে সকল দায়িত্বশীল নির্ধারণ বা বাছাই করা।

৫. বিরোধী শক্তির তৎপরতা বা বিরোধী ইউনিয়নসমূহের তৎপরতা সামনে রাখা।

৬. অর্থনেতিক অবস্থা সামনে রাখা।

৭. **Capacity** (ধারণক্ষমতা) ও Capability (সামর্থ্য) মূল্যায়ন করা।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দিক: পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ৫টি দিক গুরুত্বপূর্ণ-

১. Executive plan (কার্যকরী পরিকল্পনা) ২. Work distribution (কর্মবন্টন)
৩. Work review (পর্যালোচনা)
৪. Reporting (রিপোর্টিং) ও
৫. Supervision (তত্ত্বাবধান)।

ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়, মানুষ হিসাবে তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করে। শ্রমিকের মজুরি, ছুটি, বোনাস, গ্র্যাচুয়িটি, পেনশন, ক্ষতিপূরণ, ওভারটাইম, বকেয়াসহ চুক্তিভিত্তিক ও আইনসঙ্গত সকল প্রাপ্য আদায়, শ্রমিকের জন্য শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত-করণসহ শ্রমিককে সাংগঠনিক ও আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি।

১. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ। (৩ মাস, ৬ মাস কিংবা ১ বছর হতে পারে)।

২. সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের মাঝে কর্মবন্টন করে দেয়া।

৩. টার্গেটকৃত পেশায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডি-ফরম পূরণ করা। এ ক্ষেত্রে ডি-ফরমের সাথে শ্রমিকদের ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

৪. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পেশাভিত্তিক কমিটি ও ইউনিট গঠন করা।

৫. নিয়মিত তত্ত্বাবধান, সার্বক্ষণিক Monitoring এবং অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।

৬. টার্গেটকৃত পেশায় দাওয়াতি কাজ বৃদ্ধি করা এবং দাওয়াত প্রাপ্ত শ্রমিকদের পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করা।

৭. ব্যাপকভিত্তিক সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা

৮. প্রভাবশালী, দক্ষতাসম্পন্ন ও নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো

৯. নেতৃত্বের গুণাবলি ও গণমুখী চরিত্র সম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা

১০. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত মানসম্মত জনশক্তি খুঁজে বের করা।

১১. নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান করা

১২. নেতৃবৃন্দের সচেতন দৃষ্টি রাখা

নেতৃত্ব তৈরি ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় দিক

১. সাহসী ও নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন শ্রমিকদের বাছাই করা।

২. ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেয়ার মত মানসম্পন্ন জনশক্তিকে টার্গেট করা।

৩. একজন নয় একটা গ্রুপকে টার্গেট করা এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা।

৪. টার্গেটকৃতদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং নিয়মিত সাহচর্য প্রদান করা।

৫. সাংগঠনিক মানে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

৬. দায়িত্ব দিয়ে নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের সুযোগ করে দেয়া

৭. শ্রম আইন, শ্রমবিষয়ক জ্ঞান ও ইসলামী শ্রমনীতিবিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান করা

৮. টার্গেটকৃত পেশার জন্য বাছাইকৃত নেতৃবৃন্দকে সংশ্লিষ্ট পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সংক্রান্ত উপরে ধারণা প্রদান করা।

আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রয়োজনীয় দিক: আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত না হলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনা দুরূহ ব্যাপার। এ জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন জরুরি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা পোষণ করা

২. প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত ইউনিয়ন চাঁদা সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা

৩. নিয়মিত আয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা

৪. শুভাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধি করা

ট্রেড ইউনিয়ন মজবুতীকরণ

মজবুতি অর্জন বলতে যা বুঝায়:

১. ট্রেড ইউনিয়নের সাংগঠনিক দুর্বলতা

পরিহার করে ক্রমশ শক্তি অর্জন করে শ্রমজীবী মানুষের আস্থা অর্জন করা।

২. ট্রেড ইউনিয়নের শক্তিশালী কাঠামো তৈরি হওয়া।

৩. ট্রেড ইউনিয়নের কাজ সর্বত্র জালের মত ছড়িয়ে থাকা।

৪. প্রতিটি ইউনিয়নকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য শক্তিশালী Field হিসেবে তৈরি করা।

মজবুত ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্য:

১. নেতৃত্ব হবে গতিশীল ও স্বচালিত

২. নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা থাকবে। একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইউনিয়ন হবে না। A set of leadership থাকবে।

৩. সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। মতানৈক্য, মতপার্থক্য, চিন্তার বিভাজন, গ্রুপিং থাকবে না।

৪. Team spirit থাকা

৫. চিন্তা ঐক্য ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা

৬. প্রয়োজনীয় দাওয়াতি উপকরণ ও সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকা।

৭. আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকা

৮. প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন শ্রমিকদের ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকা

৯. ব্যাপক শ্রমিকবান্ধব ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা

১০. শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখা

১১. ইউনিয়নের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতি বছর রিটার্ন দাখিল করার সক্ষমতা।

১২. নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রতিপক্ষ, প্রতিহিংসামূলক মনোভাব না থাকা।

১৩. পারস্পরিক মতানৈক্য, মতবিরোধ ও চিন্তার ভিন্নতা পরিহার করে এক অভিন্ন চিন্তার আলোকে ইউনিয়নের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া।

১৪. পারস্পরিক পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৫. ইউনিয়নে সাংগঠনিক মৌলিক প্রোগ্রাম ও তারবিয়াতি বৈঠকাদি নিয়মিত বাস্তবায়ন হওয়া।

১৬. নিয়মিত সাধারণ সদস্য, কর্মী ও সদস্য বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত থাকা।

১৭. ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান ও শ্রমিক সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

ট্রেড ইউনিয়ন মজবুতীকরণে নেতৃত্বের ভূমিকা:

১. প্রত্যেক ইউনিয়নকে তাদের অবস্থা ও গুরুত্বের আলোকে আলাদা সাংগঠনিক মর্যাদা দিয়ে তত্ত্বাবধান করা এবং জবাবদিহি নেয়া।

২. প্রতি মাসে ইউনিয়নের কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরি ও উর্ধ্বতনে জমা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা

৩. প্রত্যেক ইউনিয়নের অবস্থার আলোকে মাসিক চাঁদা ধার্য করা এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে উক্ত ধার্যকৃত চাঁদা পরিশোধে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।

৪. ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে বছরের শুরুতে অ্যাফিলিয়েটেভুক্ত ফেডারেশনের বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে স্ব-স্ব ইউনিয়নে বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও জমা দেয়া নিশ্চিত করা।

৫. ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি/ সেক্রেটারি কমপক্ষে একজনকে সংগঠনের রুকন (সদস্য) মান নিশ্চিত করা।

৬. প্রতি বছর কমপক্ষে একবার ইউনিয়নসমূহের অবস্থান মূল্যায়নের জন্য ফেডারেশনের উদ্যোগে "ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিক দশক" পালন করা। দশকে সকল ইউনিয়নের সদস্য রেজিস্ট্রার, চাঁদা সংগ্রহের রেজিস্ট্রার, কার্যবিবরণী খাতা, রিটার্ন দাখিলসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা ও যাবতীয় কার্যক্রমের খোঁজখবর নেয়া।

৭. ফেডারেশনের উদ্যোগে ২/৩ মাস অন্তর ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বসে ইউনিয়নের সামগ্রিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা।

৮. বছরে একবার ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে "ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি/সভাপতি সম্মেলনের" আয়োজন করা।

৯. ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ "দাওয়াতি দশক" পালন করা যেতে পারে। দশকের স্ব-স্ব ট্রেড ইউনিয়ন তাদের ইউনিয়নের সদস্য বৃদ্ধির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে।

১০. প্রত্যেক ইউনিয়নের একসেট নেতৃত্ব তৈরি করা। যাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের ওপর ইউনিয়নের নির্ভরশীলতা তৈরি না হয়। কিংবা নেতৃত্ব সংকটের কারণে ইউনিয়নের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

১১. বছরে কমপক্ষে একবার ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ইউনিয়ন পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় আইনি নির্দেশনা ও শ্রম আইন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১২. প্রভাবশালী শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, মালিক, বিশেষ করে শ্রমিক সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনকারীদের ইউনিয়নের প্রভাববলয়ের নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩. চৌকস শ্রমিক নেতা ও কর্মী গঠনে পরিকল্পিত টার্গেটভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা।

১৪. ইউনিয়নভুক্ত জনশক্তির মানোন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৫. জনশক্তির মৌলিক মানবীয় গুণাবলি ও প্রতিভা বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৬. শ্রমিক সেবামূলক কাজের মাধ্যমে শ্রমিক মহলে ইউনিয়নের প্রভাব সৃষ্টি করা।

১৭. তৃণমূল পর্যন্ত ইউনিয়নের কার্যক্রম বিস্তৃত করা।

১৮. ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। ইউনিয়ন সমূহকে আন্দোলনের সত্যিকার মেজাজ ও পরিবেশের আলোকে গড়ে তোলা।

১৯. ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল নেতৃবৃন্দ ও জনশক্তির পারস্পরিক মোয়ামেলাত ও ভ্রাতৃত্ববোধ ঠিক রাখা।

২০. পরিকল্পিতভাবে ইউনিয়ন সমূহের নেতৃত্বে প্রাক্তন ছাত্রনেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা।

সম্প্রসারণ ও মজবুতি অর্জনে প্রতিবন্ধকতা:

১. নেতৃত্বের সঙ্কট

২. যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের অভাব

৩. দক্ষ জনশক্তির সঙ্কট

৪. জনশক্তির পেরেশানির অভাব

৫. আগ্রহ-উদ্দীপনার অভাব

৬. অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা

৭. সুনির্দিষ্ট সংগঠন পদ্ধতি না থাকা

৮. সামগ্রিক সহযোগিতার অভাব

৯. শ্রমিকবান্ধব কর্মসূচি স্বল্পতা

১০. নেতৃত্বের ইন-আউট বেশি হওয়া

লেখক : *কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক*
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

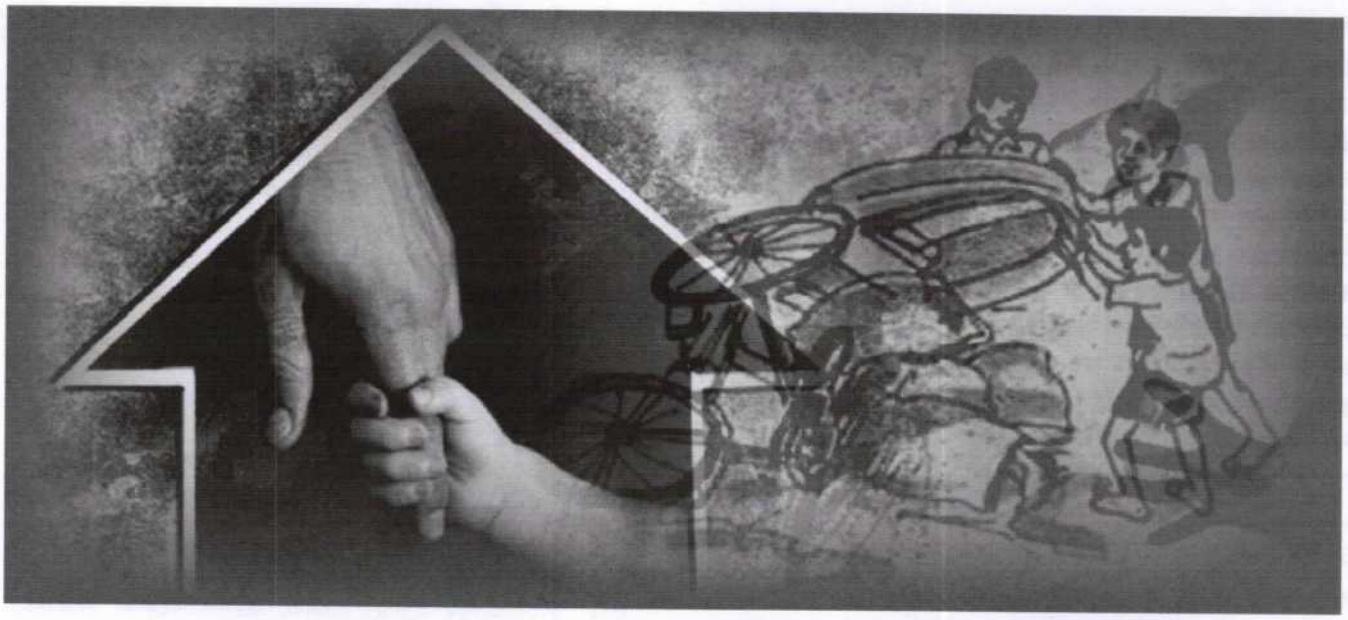

মূল্যবোধ একটি অত্যাবশ্যকীয় মানবিক গুণাবলি

ড. সৈয়দ এ.কে.এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী

মূল্যবোধ কী?

মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য যা কিছু সহায়ক তাই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ বলতে কোনো মানুষের চরিত্রের ঐ সকল উপাদানগুলোকে বুঝায়, যা দ্বারা ঐ ব্যক্তি সহজেই তার মনুষ্যত্ব বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মূল্যবোধ হলো ভালো বা মন্দ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা। অন্য কথায়, ভালো বা মন্দ, কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ঠিক বা বেঠিক সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ। মূলত মূল্যবোধ হচ্ছে কোনো কাজ বা বিষয়কে মূল্যায়নের মাধ্যমে ঠিক বা বেঠিক সম্পর্কে রায় প্রদান করা। মূল্যবোধ কোনো দৃশ্যমান বস্তু নয়। মূল্যবোধ হচ্ছে ইতিবাচক অবস্তুগত সংস্কৃতি। অর্থাৎ অবস্তুগত সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলোই হচ্ছে মূল্যবোধের মৌলিক উপাদান। মূল্যবোধের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা, তারপর ত্যাগ ও মমত্ব। অনেকে ন্যায়পরায়ণতা এবং সততাকে এক মনে করেন। আসলে সততা ন্যায়পরায়ণতার অংশ মাত্র। ন্যায়পরায়ণতা মূল্যবোধের চিরন্তন মৌলিক উপাদান। কিন্তু সততা মূল্যবোধের চিরন্তন মৌলিক উপাদান নয়। কেননা কেউ যখন সততাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে-তখন ঐ সততাতে আর মূল্যবোধ থাকে না। তা ছাড়া সততা এবং অসততা হচ্ছে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলির অংশ-মূল্যবোধের অংশ নয়। যার কারণে আমরা সমাজে আর্থিকভাবে অনেক সৎ মানুষকে দেখি, যারা অসম্ভব কৃপণ ও স্বার্থপর স্বভাবের। প্রকৃতপক্ষে যখন কোনো ব্যক্তি আর্থিকভাবে সৎ হওয়ার পাশাপাশি ত্যাগ ও মমত্বের মানসিকতাসম্পন্ন হবেন এবং সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ, সম্ভব হলে এহসান প্রদর্শন করবেন-তখনই তিনি ন্যায়পরায়ণ হবেন। আর কেবল তখনই ঐ ব্যক্তির আর্থিক সততা মূল্যবোধের উপাদান হবে। মূলত মূল্যবোধের মূল আবেদন হচ্ছে 'মানুষ মানুষের জন্য।' সে জন্য মূল্যবোধের আবেদন এবং সভ্যতার আবেদন এক ও অভিন্ন।

মূল্যবোধ বলতে কোনো মানুষের চরিত্রের ঐ সকল উপাদানগুলোকে বুঝায়, যা দ্বারা ঐ ব্যক্তি সহজেই তার মনুষ্যত্ব বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মূল্যবোধ হলো ভালো বা মন্দ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা। অন্য কথায়, ভালো বা মন্দ, কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ঠিক বা বেঠিক সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ। মূলত মূল্যবোধ হচ্ছে কোনো কাজ বা বিষয়কে মূল্যায়নের মাধ্যমে ঠিক বা বেঠিক সম্পর্কে রায় প্রদান করা। মূল্যবোধ কোনো দৃশ্যমান বস্তু নয়। মূল্যবোধ হচ্ছে ইতিবাচক অবস্তুগত সংস্কৃতি।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক

সভ্যতা কী?

সভ্যতা শব্দটি ইংরেজি civilization শব্দের প্রতিশব্দ। বিখ্যাত দার্শনিক voltaire সভ্যতাকে বুঝাতে গিয়ে সর্ব প্রথম civilization শব্দটি ব্যবহার করেন। এই শব্দটি civis বা civitas থেকে এসেছে, যার অর্থ নাগরিক। যখন কোনো জনগোষ্ঠী কোনো অঞ্চলে নগর তৈরি করে উন্নত জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে- তখন তার অগ্রগতির সহায়ক ও নিয়ামক হিসেবে উদ্ভাবিত হয় লিখনপদ্ধতি, আইন,

সরকারব্যবস্থা, বাণিজ্য, নব্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন- তখন তাকে একটা সভ্যতা বলা হয়। মূলত সভ্যতা হচ্ছে বিবর্তন নামক সিঁড়ির শীর্ষ ধাপ। যে সমাজে লেখ্য ভাষা ও বর্ণমালা আছে, ধাতুর ব্যবহার ও লিখিত দলিলের প্রচলন আছে সে সমাজই সভ্য। সভ্যতা অর্থে আমরা বুঝি, মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকল্পে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা বা সংগঠন সৃষ্টি করেছে তারই সামগ্রিক রূপ। কেবল মাত্র যে আমাদের সামাজিক সংগঠনের নানা রূপ-রীতি সভ্যতার অন্তর্গত তা নয়, নানাবিধ কারিগরি কলা-কৌশল এবং বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতা হচ্ছে- 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য'- অর্থাৎ 'মানুষে মানুষে সম্বন্ধ স্থাপন'-উহাই যথার্থ সভ্যতা। সহজ কথায়, সভ্যতা হচ্ছে-'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীর পরে-সকলের তরে, সকলে মোরা-প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'।

মানুষ জীবন রক্ষা ও জীবন উন্নয়নের জন্য পরস্পর-পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতাই মানুষের মাঝে পরিবার, চক্র, সংঘ, সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মূলত মানুষের ক্রমাগত উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন, গগনচুম্বী অট্টালিকা, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, আধুনিক শিল্প কারখানা, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ, অত্যাধুনিক ও রুচিশীল আসবাবপত্র ও ব্যবহারিক পোশাক ইত্যাদি সভ্যতার সাধারণ বাহ্যিক দিক। মানুষে মানুষে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লড়াই, হিংসা, লোভ, চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি, হত্যা, ধর্ষণ, ভোগবাদিতা, অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন ইত্যাদি সভ্যতার নেতিবাচক বাহ্যিক দিক। অপরপক্ষে, মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ত্যাগ, উদারতা, মহানুভবতা, ইনসাফ, এহসান, আতিথেয়তা এবং ব্যক্তিগত জীবনে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা উদারতা ইত্যাদি সভ্যতার অভ্যন্তরীণ ইতিবাচক দিক। সভ্যতার মূল আবেদন হচ্ছে 'ত্যাগ'। যদি সভ্যতাকে প্রশ্ন করা হয় তোমার ইতিহাস কী? সভ্যতা উত্তর দিবে "The history of civilization is the history of sacrifice" অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস মানে ত্যাগের ইতিহাস। আজকের সভ্যতায় আমরা তাজমহল দেখি, কিন্তু তাজমহল নির্মাণে ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের ত্যাগ দেখি না। আজকের সভ্যতায় আমরা বৈদ্যুতিক বাল্ব দেখি কিন্তু কেউ এর আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসনের ৯৯৯৯ বারের ব্যর্থতার ত্যাগকে দেখি না। আজকের সভ্যতায় আমরা ইসলাম নামক একটি শান্তির ধর্ম দেখি, কিন্তু এই ধর্মকে জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল (সা) ও তাঁর লক্ষ লক্ষ সাহাবার ত্যাগকে আমরা দেখি না। আজকের সভ্যতায় আমরা বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ দেখি কিন্তু এই স্বাধীনতার পেছনে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগ আমরা দেখি না। অর্থাৎ আজকের সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে আমরা যা কিছু দেখি তার পেছনে রয়েছে শুধু ত্যাগ আর ত্যাগ। ব্যক্তিগত জীবনে যে যত বেশি স্বার্থপর, ভোগবাদী সে তত বেশি অসভ্য আর যে যত বেশি উদার ও ত্যাগী, সে তত বেশি সভ্য। একটি পরিবারের সকল সদস্য যদি স্বার্থপর ভোগবাদী হয়, তাহলে ঐ পরিবারকে অসভ্য পরিবার বলা হয়। আর যদি পরিবারের সদস্যগণ পরোপকারী ও ত্যাগের মানসিকতাসম্পন্ন হয় তবে ঐ পরিবার হলো সভ্য পরিবার। অনুরূপ সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ স্বার্থপর, ভোগবাদী, লোভী, দুর্নীতিবাজ হয় তবে ঐ সমাজ ও রাষ্ট্র হবে অসভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র। আর যদি অধিকাংশ মানুষ পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও ত্যাগের মানসিকতাসম্পন্ন হয় তাহলে ঐ সমাজ ও রাষ্ট্র হবে সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে সভ্য সমাজ আর তাঁর পূর্বের সমাজব্যবস্থাকে জাহেলি সমাজ বা অসভ্য সমাজ বলে থাকি কেন? এই দুই সমাজের পার্থক্য হলো দুই সমাজব্যবস্থার মানুষের মধ্যে ত্যাগের পার্থক্য। জাহেলি সমাজের মানুষগুলো ছিল স্বার্থপর, ভোগবাদী, তাদের মাঝে কোনো ত্যাগের মানসিকতা ছিলো না। পক্ষান্তরে রাসুল (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজব্যবস্থার মানুষগুলোর মাঝে ছিল ত্যাগ, মমত্ব, ভালোবাসা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ, এহসান ইত্যাদি। তাই যুগ-যুগ ধরে সকল সমাজের, সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল গোত্রের মানুষের নিকট সভ্যতার যে চিরন্তন আবেদন ছিল এবং থাকবে তা হল- ত্যাগ আর ত্যাগ- মমত্ব আর উদারতা- ভ্রাতৃত্ব আর ভালোবাসা।

সংস্কৃতি কী? :

মানবসৃষ্ট যা কিছু রয়েছে সবই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে জীবনদর্পণ। মূলত সংস্কৃতি বলতে কোনো জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-কর্ম তথা জীবনযাত্রার সামগ্রিক প্রণালীকে বুঝায়। অন্যকথায় সংস্কৃতি মানে, মানুষের সূক্ষ্ম ও সু-কোমল আবেগ অনুভূতি এবং হৃদয় আত্মার দাবি ও প্রবণতা পূর্ণ করে যে সব উপায় উপকরণ তাই হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি দুই প্রকার- প্রথমত, বস্তুগত সংস্কৃতি, দ্বিতীয়ত, অবস্তুগত সংস্কৃতি। মানুষের বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, আসবাবপত্র, যানবাহন, কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগব্যবস্থা ইত্যাদি দৃশ্যমান সব কিছুই বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, পারস্পরিক সম্পর্ক, মনের ভাব, শিক্ষা-সাহিত্য, স্বার্থপরতা, ভোগবাদিতা, ত্যাগ, মমত্ব ইত্যাদি অদৃশ্যমান বিষয়গুলো অবস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আবার অবস্তুগত সংস্কৃতির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দু'টি দিক রয়েছে। ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে ত্যাগ, মমত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, ইনসাফ, সততা, উত্তম আচরণ, সরলতা, এহসান, আতিথেয়তা এবং অন্যের প্রাপ্তিতে নিজের প্রাপ্তির চাইতে অধিক তৃপ্ত হওয়া উল্লেখযোগ্য। আর নেতিবাচক দিকসমূহের মধ্যে স্বার্থপরতা, ভোগবাদিতা, সংকীর্ণ মানসিকতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, বিবেকহীনতা, হিংসা, লোভ, অহংকার, অসদাচরণ, অতিথি-বিমুখতা উল্লেখযোগ্য। একটা সমাজের অধিকাংশ মানুষের অবস্তুগত সংস্কৃতি যদি ইতিবাচক হয়, তবে ঐ সমাজকে মূল্যবোধ সমন্বিত সমাজ বা সভ্যসমাজ বলা হয়। আর অধিকাংশ মানুষের অবস্তুগত সংস্কৃতি যদি নেতিবাচক হয়, তবে ঐ সমাজকে মূল্যবোধ বিবর্জিত সমাজ বা অসভ্যসমাজ বলা হয়। তাহলে কোন মানবসমাজের মূল্যবোধ নির্ভর করে ঐ সমাজের মানুষের অবস্তুগত সংস্কৃতির ওপর।

বর্ণিত আলোচনায় আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে ধারণা পেলাম-তাতে দেখা যায় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূলত সভ্যতার আবেদন, সংস্কৃতির আবেদন এবং মূল্যবোধের আবেদন এক ও অভিন্ন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা ইতিবাচক দিক- মূল্যবোধেরও তা ইতিবাচক দিক। আবার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা নেতিবাচক দিক-মূল্যবোধেরও তা নেতিবাচক দিক। মূলত সভ্যতা সুন্দর হলে সংস্কৃতি সুন্দর হবে এবং মূল্যবোধ সুদৃঢ় হবে। সভ্যতা অসুন্দর হলে সংস্কৃতি অপসংস্কৃতিতে রূপ নিবে এবং সমাজ তখন মূল্যবোধ বিবর্জিত হবে।

রাষ্ট্রের পঞ্চম উপাদান হিসেবে মূল্যবোধ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে প্রথমত; জনগণ, দ্বিতীয়ত; ভূমি, তৃতীয়ত; সরকার এবং চতুর্থত; সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে আল ফারাবি এবং ইবনে খালদুন এর সাথে 'আদর্শ' যোগ করেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, 'উদ্দেশ্য

মূলে প্রয়োজনাত্মক রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে বটে, কিন্তু আদর্শ বা মূল্যবোধ ছাড়া রাষ্ট্র স্থায়ী হয় না।' ইবনে খালদুনের এই চিন্তাকে পরবর্তীতে সমাজতন্ত্রপন্থী কার্ল মার্কসসহ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রপন্থীরাও সমর্থন করেন এবং সকলে একমত হন যে, মূল্যবোধ হচ্ছে রাষ্ট্রের পঞ্চম উপাদান। মূল্যবোধ ব্যতীত একটি রাষ্ট্রব্যর্থ এবং অকার্যকর রাষ্ট্র হতে বাধ্য। কিন্তু এই মূল্যবোধের জোগান কোথা হতে আসবে বা মূল্যবোধের উৎস কী? এর কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রপন্থীরা না দিলেও আল ফারাবি এবং ইবনে খালদুন ধর্মীয় জ্ঞানকেই মূল্যবোধের একমাত্র উৎস বলে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সে আলোকে কোনো কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টও স্রষ্টার অধীনে প্রজাতন্ত্রকে পরিচালনার শর্তযুক্ত করে তাদের মতামত পেশ করেন। যেমন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, "This republic under God or this nation under God is-Government of the people, by the people, for the people"। কিন্তু আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রপন্থীরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সংজ্ঞার প্রথম অংশ বাদ দিয়ে কেবল Government of the people, by the people, for the people-এই অংশের প্রচার চালিয়ে রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। অথচ মূল্যবোধ হচ্ছে রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় পঞ্চম মৌলিক উপাদান, যার একমাত্র উৎসস্থল হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞান।

মূল্যবোধের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র সমূহ

শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ :

সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় পারিবারিক পরিসরে। এই শিক্ষা একদিকে যেমন অক্ষর জ্ঞান, অন্যদিকে মূল্যবোধের জ্ঞান। পিতা-মাতা সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসার জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। পরোপকারের গুরুত্বের শিক্ষা দেবেন, সন্তান যাতে স্বার্থপরতা তথা- আত্মকেন্দ্রিক মানসি-কতা পরিহার করে ত্যাগ ও মমত্বের মানসিকতায় গড়ে ওঠে এবং সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতার হক আদায় করবে, তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না। এ ছাড়া আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক আদায় করা, মেহমানকে উত্তম আতিথেয়তার মাধ্যমে বরণ করা, অসহায়– দরিদ্রদের দান-সাদকা করা, পরিবারকে সম্পূর্ণ মদ, জুয়া, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং যৌতুকমুক্ত রাখা ইত্যাদি পারিবারিক মূল্যবোধের অংশ। মূলত পরিবার হচ্ছে সন্তানের জন্য এমন একটা ইনস্টিটিউশন যেখান থেকে মূল্যবোধের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সে লাভ করবে এবং তা শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে।

আধুনিক প্রগতিবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় বিশ্বাসী বলে তারা ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসনকে প্রগতির অন্তরায় মনে করে। কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থায় যে মূল্যবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তার বাস্তব প্রমাণ হলো-আজকে আমাদের দেশের দুর্নীতি। আমাদের দেশের যে সকল রাঘববোয়াল কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে তারা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় তথা নৈতিক শিক্ষা ছিল না বলেই তাদের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়নি। ফলে তারা যত বড় শিক্ষিত হয়েছে-তত বড় দুর্নীতিবাজও হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জর্জ স্টার্নলি হল বলেন-If you teach your children the three R- Reading, Writing and Arithmetic, leaving out of the fourth R (Religion) you end up with fifth R (Rascality) অর্থাৎ 'তুমি যদি তোমার সন্তানকে পড়ালেখা এবং গণিত শেখাও, কিন্তু চতুর্থ পর্যায়ে ধর্ম না শেখাও তবে তুমি তাকে ঠেলে দিবে Rascality বা বদমায়েশির দিকে।' সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

পারিবারিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধ :

সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় পারিবারিক পরিসরে। এই শিক্ষা একদিকে যেমন অক্ষর জ্ঞান, অন্যদিকে মূল্যবোধের জ্ঞান। পিতা-মাতা সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসার জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। পরোপকারের গুরুত্বের শিক্ষা দেবেন, সন্তান যাতে স্বার্থপরতা তথা-আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা পরিহার করে ত্যাগ ও মমত্বের মানসিকতায় গড়ে ওঠে এবং সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতার হক আদায় করবে, তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না। এ ছাড়া আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক আদায় করা, মেহমানকে উত্তম আতিথেয়তার মাধ্যমে বরণ করা, অসহায়– দরিদ্রদের দান-সাদকা করা, পরিবারকে সম্পূর্ণ মদ, জুয়া, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং যৌতুকমুক্ত রাখা ইত্যাদি পারিবারিক মূল্যবোধের অংশ। মূলত পরিবার হচ্ছে সন্তানের জন্য এমন একটা ইনস্টিটিউশন যেখান থেকে মূল্যবোধের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সে লাভ করবে এবং তা শুধু সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধ :

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি রয়েছে অনেক সামাজিক দায়িত্ব। কেউ অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, বিপদে পড়লে পাশে থাকা, মারা গেলে জানাজায় যাওয়া, কেউ পাপের পথে পা বাড়ালে তাকে সে পথ থেকে ফেরানো ইত্যাদি। এর পাশাপাশি সমাজের মানুষের মাঝে মূল্যবোধকে বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও মানুষের সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আজ প্রগতিশীল সমাজ দার্শনিকদের 'খাও, দাও, ফুর্তি করো' নীতির ভিত্তিতে যে ভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাতে কোন ধরনের মূল্যবোধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীতে নাস্তিক্যবাদীরা আজ যে সমাজ প্রতিষ্ঠায় তৎপর তার মূল দর্শন হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক। ভোগবাদী সমাজের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষকে স্বার্থপর করে তোলা। ভোগবাদী সমাজের মানুষের মনোবৃত্তি এতটা পশুসুলভ হয় যে, নিজের স্বার্থ ব্যতীত অন্য কারো জন্য চিন্তা করার মানসিকতা ঐ সমাজের কারো মাঝে থাকে না। ফলে মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, খুন, ধর্ষণ, ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি ভোগবাদী সমাজের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার

হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ধর্ম মানুষকে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। 'তোমরা উত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য'– ধর্মের এই মহান বাণী প্রত্যেক মানুষের মাঝে মমত্ব, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, ভালোবাসা সৃষ্টি হতে প্রেরণা জোগায়। মূলত যে সমাজব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবোধের আলোকে তার মাঝে বসবাসরত মানুষদের পরিচালনা করে ঐ সমাজব্যবস্থাই আদর্শ সমাজব্যবস্থা। সামাজিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের উপস্থিতি একজন মানুষকে শুধু সামাজিক মানুষ হিসেবেই গড়ে তোলে না বরং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার প্রেরণা জোগায়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধ :

অর্থনীতি মানবজীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থের সাথে শুধু মান-সম্মানের সম্পর্ক নয় বরং বাঁচা-মরার সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধের ঘাটতি হলে অর্থব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। অর্থনীতিতে মূল্যবোধ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট হয় অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী ড. অমর্ত্য সেনকে করা এক প্রশ্নের উত্তরে। নোবেল বিজয়ী হওয়ার পর তিনি যখন প্রথম বাংলাদেশ সফরে আসেন, তখন সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিল, অর্থনীতির সফলতার জন্য কী কী নীতি বা পলিসি অবলম্বন করা দরকার? সাংবাদিকদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শুধু অর্থনীতি কেন! গোটা পৃথিবীতে আজ যত নীতি রয়েছে সকল নীতির সফলতা বা সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন এথিক্স (Ethics) বা নীতিশাস্ত্রের। তার মতে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নীতিহীন হলে রাজনীতি কলুষিত হয়, বিচারক নীতিবিবর্জিত হলে বিচার নীতি কলুষিত হয়, দেশে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা নীতিহীন হলে অর্থনীতি কলুষিত হয়।' তিনি আরো বলেন, 'একটি দেশের অর্থনীতির ওপর সে দেশের শেয়ার মার্কেটের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে। আর কোনো দেশে যদি বড় ধরনের শেয়ার কেলেঙ্কারি হয় তবে সে দেশের অর্থনীতিতে অবশ্যই ধস নামবে। আর কেলেঙ্কারি বিষয়টি অবশ্যই নীতিবিবর্জিত।' 'সত্যিকারের নীতিশাস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে?' এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা যে যে ধর্মের অনুসারী সে সেই ধর্ম থেকে নীতিশাস্ত্রকে গ্রহণ করতে পারি।' ড. অমর্ত্য সেনের এই বক্তব্যে নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক মূল্যবোধ যে অর্থনীতির একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং নীতিশাস্ত্রের জোগান যে একমাত্র ধর্মই দিতে পারে তা অকপটে প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধ :

একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের জন্য প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে আগে সৎ মানুষ তৈরি হওয়া। কেননা ব্যক্তি সততার মাধ্যমে সমাজ সৎ হয়– আর সমাজ সততার মাধ্যমে রাষ্ট্র সৎ হয়। তাই ব্যক্তিগত নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভাবিত হয়। অনেকগুলো অসৎ মানুষের সংঘবদ্ধ সমাজজীবন যেমন কখনও ঐ সমাজে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হয় না, তেমনি অনেকগুলো সৎ মানুষের সংঘবদ্ধ সমাজজীবন ঐ সমাজকে শুধু সুন্দরই করে না বরং আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত করে। তাই মৌলিক বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিগত নৈতিক ভিত্তি। নৈতিক সততার ওপর ভর করে যে মূল্যবোধের সূচনা হয় তা শুধু একটি নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের পথকেই সুগম করে না বরং একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিতকেও মজবুত করে। ব্যক্তিগত নৈতিক ভিত্তির উত্তম উদাহরণ রয়েছে হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে এক কুমারী মেয়ের ঘটনায়। ঘটনাটি হলো– 'প্রতিদিনের মত, একদা ওমর (রা) শেষ রাত্রে একটি মরু কুটিরে বাতির আলো দেখতে পেলেন। বিপদগ্রস্ত পরিবার মনে করে তিনি আলোর উৎসের সন্ধানে গেলে, কুটির থেকে এক মায়ের ডাক শুনতে পেলেন। মা বলছেন, আমেনা উঠ, দুধে পানি মিশাতে হবে সকাল হলে তা সম্ভব হবে না। মেয়ে আমেনা প্রত্যুত্তরে বললো, মা খলিফা ওমর নিষেধ করেছেন দুধে পানি না দিতে। মা ধমকের সুরে বললেন, এখানে কি খলিফা ওমর দাঁড়িয়ে আছেন যে, তোমার কাজ দেখবেন? মেয়ে শুধালো, মা ওমর এখানে না থাক, আল্লাহতো সব অবলোকন করছেন, এতে মা লজ্জা পেলেন। ওমর কালবিলম্ব না করে সকাল হতেই তাঁর ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। পুত্রদের উদ্দেশে ওমর বললেন, হে পুত্রগণ! আমি তোমাদেরকে একটি মেয়ের সন্ধান দিবো, সে একটি জীবন্ত রত্নের মতো। বেদুইন বস্তির ঐ ঘরের বাসিন্দা সে, আমি তাকে দেখিনি, গলা শুনেছি মাত্র। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাকে নিজের যোগ্যতায় বউ করে আনো তাহলে স্বামী হিসেবে সে উপকৃত ও ভাগ্যবান হবে। বলা মাত্রই এক সন্তান দাঁড়িয়ে গেল, তিনি বললেন, পিতাজি, আপনার পক্ষ থেকে আত্মীয়তা করার প্রস্তাব পেলে আমি এক্ষুনি সে মেয়ের পিতার কাছে বিয়ের পয়গাম দিতে চাই।" যদি কোনো সমাজের সকল মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক ভিত্তি এই বেদুইন মেয়ের তাকওয়ার আদলে প্রতিষ্ঠিত থাকে– তবে সেই সমাজই হবে নৈতিক সমাজ, সেই সমাজের মূল্যবোধের সুফল ভোগ করবে সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষ।

মূল্যবোধ হচ্ছে বড় ধরণের কমিটমেন্ট

সমাজবদ্ধ মানুষের যেমনি অসংখ্য দায়বদ্ধতা (Obligation) রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক কমিটমেন্ট (Commitment)। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ মানুষকে ওয়াদার ব্যাপারে বার বার সতর্ক করেছেন। কমিটমেন্ট বা ওয়াদা হচ্ছে এক প্রকার আমানত। অন্য কথায় ওয়াদা এক ধরনের ঋণ। আর মূল্যবোধ হচ্ছে একটি বড় ধরনের কমিটমেন্ট। মানুষ হিসেবে এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীব হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে কমিটমেন্ট থাকতে হবে। যেমন ব্যক্তির নিজের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'সততা ও ন্যায়পরায়ণতা'। পিতামাতার প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'তাদের সেবা করা'। সন্তানের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'তাদের সত্যিকারের মানুষ রূপে গড়ে তোলা'। পরিবারের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'মার্জিত ব্যবহার, রহমদিল ও উদার মানসিকতা সম্পন্ন হওয়া।' বিবাহের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'পারস্পরিক বিশ্বস্ততা।' আত্মীয়ের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'সুসম্পর্ক রাখা এবং প্রয়োজনে পাশে থাকা।' প্রতিবেশীর প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'তাদের হক আদায় করা।' বন্ধুর প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'বন্ধুকে বিশ্বাস করা এবং বন্ধুর বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে সম্মান করা।' ধর্মের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'নিজে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং অন্যকে মানার জন্য অনুপ্রাণিত করা।' সুন্দর রুচিবোধের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'মার্জিত ব্যবহার'। খদ্দেরের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা।' সমাজের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'দায়বদ্ধতা'। দেশপ্রেমের প্রতি কমিটমেন্ট হলো 'আত্মত্যাগ'। আর এ সকল কমিটমেন্টের সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে মূল্যবোধ সমন্বিত জীবনগঠনের তৌফিক দিন এই কামনা করি। আমিন।

লেখক : *কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক*
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি আন্দোলন প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মুহা: আলমগীর হোসাইন

পোশাকশিল্পে কর্মরত প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক অত্যন্ত পরিশ্রম করে দেশ এবং শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে আসছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও শিল্প উন্নতির লক্ষ্যে ভোর ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে চলেছেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নতুন করে নির্ধারণের জন্য একটি মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০% বৃদ্ধিতে অর্থাৎ ৬ হাজার ৩৬০ টাকা দিতে রাজি হয় মালিকপক্ষ। সর্বশেষ মজুরি বোর্ডের তৃতীয় সভায় গত ১৬ জুলাই ২০১৮ এ প্রস্তাব করেন গার্মেন্টস মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। এদিকে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যখন ব্যবধান বিস্তর তখন বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় শ্রমিক লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক শামসুন্নাহার ভূঁইয়া ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ২০ টাকা করার প্রস্তাব দেন। তবে শামসুন্নাহার ভূইয়ার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনে থাকা শ্রমিক সংগঠনগুলো। তাদের দাবি মাসিক ন্যূনতম বেতন ১৬,০০০ টাকা। গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মজুরি বোর্ডের সভায় ন্যূনতম মজুরি আট হাজার টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়।

বর্তমানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে ৫ হাজার ৩শ টাকা। এটি নির্ধারণ করা হয় ২০১৩ সালে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর শ্রমিকদের মজুরি নতুন করে নির্ধারণ করা হয় বলে জানিয়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। মজুরি বোর্ড ঘোষণা করেন নতুন বেতন কাঠামোতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মূল বেতন হবে ৪ হাজার ১শ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২ হাজার ৫০ টাকা। সব মিলিয়ে ন্যূনতম বেতন দাঁড়াবে ৮ হাজার টাকা। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে এই নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হবে। মজুরি বোর্ড যে মজুরি ঘোষণা করেছে তা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ হয়নি এবং দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক সংগঠনগুলি মজুরির দাবিতে যে আন্দোলন করে আসছিল তার সঠিক মূল্যায়ন করেনি মজুরি বোর্ড। এই সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করেছেন।

বাংলাদেশে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারশেনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'গার্মেন্টস শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য গঠিত মজুরি বোর্ডের সুপারিশে সরকার গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে। অথচ শ্রমিক সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে ১৬ হাজার টাকা মজুরির দাবি জানিয়ে আসছিল। সরকার মালিকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শ্রমিকদের দাবির সঙ্গে প্রহসনমূলক মজুরি ঘোষণা করেছে।' সিপিবি সমর্থিত গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি জলি তালুকদার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'সরকার ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার মাধ্যমে শ্রমিকদের সাথে অন্যায় করেছে। আমরা ঘৃণাভরে এই মজুরি প্রত্যাখ্যান করলাম।' পোশাকশ্রমিক নেতা মোশরেফা মিশু বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'এই মজুরি কাঠামার মাধ্যমে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মালিকরা, তাদের সাথে যোগ দিয়েছে সরকার।' গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়কারী মাহবুবুর রহমান ইসমাইল বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'আমরা এই মজুরি মানি না। আমরা প্রতিবাদ কর্মসূচি করব। আশা করি, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাবি পুনর্বিবেচনা করবেন।' বিএনপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসাইন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, '৮ হাজার টাকা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাস্তবতার নিরিখে এটা পোশাকশ্রমিকদের সাথে তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।' ইন্ডাস্ট্রিয়াল

দেশের উল্লেখযোগ্য ১০টি শিল্প খাতের মধ্যে পোশাকশ্রমিকের মজুরিই সবচেয়ে কম। অথচ পোশাক খাতই দেশের সবচেয়ে ব্যবসাসফল শিল্প খাত। এই শিল্প থেকেই দেশের ৭৮ ভাগ রপ্তানি আয় হয়। বাংলাদেশ বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ও বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন। বিদেশি বড় ক্রেতারা বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে জানেন। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকদের নিরাপত্তা, মজুরি ও জীবনযাত্রার নিম্নমানের বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। এ অবস্থায় সরকার পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। জীবনযাত্রার ব্যয়সহ আনুষঙ্গিক বিষয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ১৬ হাজার টাকা নিম্নতম মজুরির দাবি করা হয়েছে। কিন্তু পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সব মিলিয়ে ন্যূনতম বেতন ৮ হাজার টাকা দিতে চাইছে।

বাংলাদেশ কাউন্সিলের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশ আসে গার্মেন্ট শিল্প থেকে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, এ খাতের শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেয়া হয় না। আমি সরকার ও মালিকপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই বড় আন্দোলনে যাওয়ার আগেই ১৬ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করুন। না হলে দেশের পোশাক খাত শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে।'

প্রসঙ্গত, গার্মেন্টস শ্রমিকদের তীব্র আন্দোলনের পর মজুরি বোর্ড ২০১৩ সালে পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকা ঘোষণা করে যেখানে দাবি ছিল ন্যূনতম মজুরি ৮০০০ টাকার। সর্বশেষ ২০১৩ সালে যে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা হয়েছিল ৫৩০০ টাকা; যাতে খাদ্যভাতা হচ্ছে ৬৫০ টাকা, বাড়িভাড়া ১২০০ টাকা, যাতায়াত ভাড়া ২৫০ টাকা, মেডিক্যাল ২০০ টাকা, বেসিক ৩০০০ টাকা।

'ট্রেডিং ইকোনমিকসের ২০১৮ সালের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী মার্কিন ডলারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন দেখানো হয়েছে ৬৩.২৬ ডলার। যেখানে কানাডার ২৬১৭ ডলার, ফ্রান্সের ১৮৩০ ডলার, জার্মানির ২৫৯১ ডলার, যুক্তরাজ্যের ২৬১৯ ডলার, যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৪০ ডলার এবং জাপানের ১৮৭০ ডলার। আইএলও ১০০ ডলারের নিচে বেতন যেই যেই দেশের তার একটি তথ্য দিয়েছে যার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে। রানা পাজা দুর্ঘটনার পর সিএনএন একটা তথ্য প্রতিবেদনে দেখিয়েছিল আমেরিকাতে তৈরি একটা ডেনিম শার্টের মজুরি পড়ে ৭.৪৭ ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৬০০ টাকা।

অন্য দিকে বাংলাদেশে তৈরি শার্টটির মজুরি পড়ে দশমিক ২২ ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১৮ টাকা। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের মজুরি কাঠামোকে অস্বাভাবিক উল্লেখ করে ২০০৬ সালে দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশে উৎপাদিত একটি গার্মেন্টস পণ্য ইউরোপে বা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১০০ ডলার বিক্রি হলে কারখানার মালিক পান ১৫ থেকে ২০ ডলার, উৎপাদিত রাষ্ট্র ২৫-৩০ ডলার এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠান ৫০-৬০ ডলার পেয়ে থাকে। উৎপাদনকারী শ্রমিকের ভাগে পড়ে মাত্র ১ ডলার!

শ্রমিকদের বাড়িভাড়া, যাতায়াত ভাড়া, চিকিৎসাব্যয় বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পোশাকশিল্পে শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণের দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ২৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের গার্মেন্টস রপ্তানি করে থাকে। সরকার সেটাকে ২০২১ সাল অর্থাৎ স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বার্ষিকীর মধ্যে ৫০ বিলিয়নে দাঁড় করাতে চায়। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। যাদের শ্রমের বিনিময়ে আজ আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশের স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছি তাদের শ্রমের মূল্য ও জীবনমান উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রধান। আর তা করতে হবে তাদের মজুরি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। পোশাকশিল্পে কর্মরত এই বিশাল (৫০ লক্ষ) শ্রমিকগোষ্ঠীকে হতাশায় রেখে ৫০ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। হতাশা ও অনিশ্চয়তা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, নষ্ট করে দেয় শ্রমশক্তি। তাই যতদ্রুত সম্ভব শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি মেনে নেয়া প্রয়োজন।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরির সাথে অন্যান্য সেক্টরের তুলনা:

দেশের উল্লেখযোগ্য ১০টি শিল্প খাতের মধ্যে পোশাকশ্রমিকের মজুরিই সবচেয়ে কম। অথচ পোশাক খাতই দেশের সবচেয়ে ব্যবসাসফল শিল্প খাত। এই শিল্প থেকেই দেশের ৭৮ ভাগ রপ্তানি আয় হয়। বাংলাদেশ বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ও বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন। বিদেশি বড় ক্রেতারা বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে জানেন। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকদের নিরাপত্তা, মজুরি ও জীবনযাত্রার নিম্নমানের বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। এ অবস্থায় সরকার পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। জীবনযাত্রার ব্যয়সহ আনুষঙ্গিক বিষয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ১৬ হাজার টাকা নিম্নতম মজুরির দাবি করা হয়েছে। কিন্তু পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএ-মইএ সব মিলিয়ে ন্যূনতম বেতন ৮ হাজার টাকা দিতে চাইছে। ২০১০ থেকে ১২ সালের মধ্যে গঠিত বিভিন্ন ন্যূনতম মজুরি বোর্ডে ঘোষিত মজুরি কাঠামো অনুযায়ী, বর্তমানে নির্মাণশিল্প ও কাঠের কাজ করেন এমন শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি ৯ হাজার ৮৮২ টাকা। ট্যানারি শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি ৯ হাজার ৩০০ টাকা। তেল মিলের শ্রমিকের মজুরি সর্বনিম্ন ৭ হাজার ৪২০ টাকা। ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহনে ৬ হাজার ৩০০ টাকা, রি-রোলিং মিলে ৬ হাজার ১০০ টাকা, কোল্ড স্টোরেজে ৬ হাজার ৫০ টাকা। এমনকি ধান ভাঙানোর চাতালে আধা দক্ষ শ্রমিকের মজুরিও এখন ৭ হাজার ১৪০ টাকা। কিন্তু পোশাকশিল্পে মজুরি মাত্র পাঁচ হাজার তিনশত টাকা ছিল নতুন মজুরি ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত।

অন্যান্য দেশের সাথে মজুরির তুলনা:

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পোশাকশ্রমিকের মজুরিও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। সর্বনিম্ন মজুরি এখন ৮ হাজার টাকা। এটি অন্যান্য সকল গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশের চেয়ে অনেক কম। আইএলও-র Minimum wages in the global garment industry : Update for 2015Õ প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি শ্রীলংকায় ৬৬-৮০ ডলার (দক্ষতাভেদে), বাংলাদেশে ৬৮ ডলার, ভারতে ৭৮-১৬৫ ডলার (রাজ্য ও দক্ষতার মান ভেদে), পাকিস্তান ৯৯-১১৯ ডলার, ভিয়েতনামে ১০০-১৪৫ ডলার, কম্বোডিয়ায় ১২৮ ডলার, ইন্দোনেশিয়া ৯২- ২১৩ ডলার, মালয়েশিয়া

২২৫-২৫৩ ডলার, চীন ১৬৫-২৯৭ ডলার (প্রদেশভেদে), তুরস্ক ৫১৭ ডলার, মেক্সিকো ১৫১-১৬৩ ডলার। এর মধ্যে কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের সরকার মজুরি বাড়িয়েছে। তারা ২০১৬ সাল থেকে নির্ধারণ করেছে যথাক্রমে ১৪০ ডলার ও ১০৭-১৫৬ ডলার। পাকিস্তান জুন, ২০১৫ থেকে মজুরি বাড়িয়েছে সর্বনিম্ন প্রায় ১২০ ডলার নির্ধারণ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক সরকার শ্রমিকের জন্য খুবই সস্তায় আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য সুবিধাও দিয়ে থাকে। এই দেশটি এখন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগী দেশ। রানা প্লাজা ধসে এক হাজার ১৩২ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু আর তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডে ১১২ জন শ্রমিকের প্রাণহানির পর বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এখানে ধারাবাহিক শ্রমিক অসন্তোষের মূলে রয়েছে কম মজুরি। এ কারণে গোটা পোশাক খাতের ভবিষ্যৎই ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন কত হওয়া উচিত

বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) সম্প্রতি করা এক জরিপে প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, ঢাকা শহরে সাদামাটা জীবন যাপন করতে চার সদস্যের একটি শ্রমিক পরিবারের মাসে কমপক্ষে ১২ হাজার টাকার প্রয়োজন। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে কোনোরকমে টিকে থাকতে শ্রমিক পরিবারকে খরচ করতে হচ্ছে যথাক্রমে ১৩ হাজার ২৪০, ১৩ হাজার ৪৮১ ও ১১ হাজার ১১১ টাকা। জরিপে পাওয়া প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী, ঢাকায় একজন পোশাকশ্রমিকের মাসে কমপক্ষে পাঁচ হাজার ২২ টাকার প্রয়োজন হয় একজন সদস্যের জন্য। পরিবারে মোট সদস্য চারজন হলে প্রায় মাসিক খরচ দাঁড়ায় বিশ হাজার টাকা। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে দরকার হয় যথাক্রমে চার হাজার ৮৯৮, পাঁচ হাজার ১১৩ ও চার হাজার ৮২৯ টাকা। জরিপে শ্রমিকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, কত টাকা হলে তারা মোটামুটিভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন। তারা জানিয়েছেন, ঢাকায় চার সদস্যের পরিবারের জন্য প্রয়োজন ১৯ হাজার ৭৩৫ টাকা। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে প্রয়োজন যথাক্রমে ১৯ হাজার ৫৩৫, ২০ হাজার ৩৪ ও ১৮ হাজার ৭০১ টাকা। একইভাবে ঢাকার একজন শ্রমিকের জন্য ১০ হাজর ৭৪৯, গাজীপুরে ৯ হাজার ৮৩৩, নারায়ণগঞ্জে ১১ হাজার ২৩২ ও চট্টগ্রামে ৯ হাজার ৬৮৯ টাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন জরিপে অংশ নেয়া শ্রমিকেরা।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) হিসেবে, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য মূলত তিনটি মডেলকে বিবেচনায় নেয়া হয়। এর প্রথম মডেলটি হচ্ছে, দারিদ্র্যসীমার ওপরে অবস্থানকারী একজন শ্রমিকের মাসিক খরচের হিসাব বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা। দ্বিতীয় মডেলটি হলো, কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি অর্জনের জন্য একজন মানুষের যে সুষম খাবার, তা বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা। তৃতীয় মডেলটি হলো, শ্রমিকদের বর্তমান জীবনধারণের খরচের হিসাব বিবেচনা করে তার ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা।

সিপিডি বলেছে, দারিদ্র্যসীমার ওপরের স্তরে অবস্থানকারী প্রায় পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারে 'জাতীয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ' অনুযায়ী খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্য ও সেবা কেনার ব্যয় মাসে ৯ হাজার ২৮০ টাকা। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীকে এক্ষেত্রে আয় করতে হবে ৬ হাজার ৪৪৫ টাকা। সিপিডির হিসেবে পরবর্তী দু'টি মডেলে এই পরিমাণ আরও বাড়ে। কাঙ্ক্ষিত পুষ্টিহার অনুযায়ী খাবার গ্রহণ ও জীবনধারণের জন্য একজন শ্রমিকের প্রতি মাসে ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন ১৭ হাজার ৮৩৭ টাকা। প্রকৃত খরচ অনুযায়ী বিবাহিত একজন শ্রমিকের মাসে আয় করতে হবে ১০ হাজার ৩৫২ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট হিসাব করে দেখিয়েছেন দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজ করলে (যদিও বাস্তবে ১৪-১৬ ঘন্টা হামেশাই শ্রমিকরা কাজ করে থাকে) একজন পুরুষ শ্রমিকের ৩৩৬৪ কিলোক্যালরি এবং নারীশ্রমিকের ২৪০৬ কিলোক্যালরি তাপ দেহে (যদিও নারীদের মাতৃত্বকালীন সময়ে অনেক বেশি দরকার হয়) প্রয়োজন হয়। সুতরাং নর-নারী নির্বিশেষে গড়ে (৩৩৬৪+২৪০৬/২) ২৮৮৫ কিলোক্যালরি তাপ উৎপাদন সংবলিত খাদ্য প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আরও ৮৫ কিলোক্যালরি বাদ দিয়েছে ন্যূনতম ২৮০০ কিলোক্যালরি তাপ উৎপাদন করতে পারে শরীরে এমন খাদ্য গ্রহণ করার জন্য খাদ্য খরচ পড়বে ১০৯ টাকা প্রতিদিন। সব কিছু মিলে অবশ্যই একজন শ্রমিকের মূল বেতন ১০ হাজার ও মোট বেতন ১৬ হাজার টাকা হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকরা এই ন্যায্য দাবিতেই লড়ছে। কিন্তু সরকার এই দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে হামলা হুমকি ভয় গ্রেফতার করে মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করছে।

গার্মেন্টস শিল্পের আয় বেড়েছে:

বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। ২০২১ সালে পোশাক রপ্তানি পাঁচ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। সব দেশের মোট রপ্তানি আয়ের (৩ হাজার ১২০ কোটি ডলার) প্রায় ৮২ শতাংশ। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের মোট পণ্য রপ্তানির ৮১ দশমিক ৬৬ শতাংশ বা ১ হাজার ৩১৩ কোটি ৫৫ লাখ ডলার পোশাক খাত থেকে এসেছে। এই আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে তা গত অর্থবছরের একই সময়ের ১ হাজার ২০২ কোটি ডলারের রপ্তানির চেয়ে ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএ-মইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান দৈনিক প্রথম আলোকে বলেন, আগামী ছয় মাস পোশাক রপ্তানি ভালো ছাড়া খারাপ হবে না। একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এখানে কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের পোশাকের রপ্তানি আয় ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ১১ দশমিক ৪১ শতাংশ।

মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিকদের সময়ের দাবি:

জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির কারণে সরকার নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। সম্প্রতি বেতন বাড়ানো হয়েছে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রী- এমপিদের। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি কাঠামো ১৬ হাজার টাকা ঘোষিত হবে না কেন? শ্রমিকরাও তো একই বাজার থেকে কেনা-কাটা করে। সরকার দাবি করছে– দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, অচিরেই 'মধ্যম আয়ের দেশ' হতে যাচ্ছে, তাহলে শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হবে না কেন? দেশে জাতীয় আয় বাড়ানোর পেছনে শ্রমজীবী মানুষের অবদানই তো সবচেয়ে বেশি। শিল্প বাঁচানোর কথা বলে শ্রমিকদের মানবেতর জীবনে ফেলে রাখা হবে তা মেনে নেয়া যায় না। তাই আজ দাবি উঠেছে শ্রমিকদের মানুষের মত বাঁচার উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও ঘোষণা করতে হবে।

লেখক : *কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক*
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

মাসায়েল : সিরাতুন্নবী (সা)

১। প্রশ্ন : মহানবী (সা) এর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ কবে?

উত্তর : বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "রাসূল সা. সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়্যত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ানা করেন, সোমবারে মদীনায় পৌছান এবং সোমবারেই তিনি হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।" (মুসনাদে আহমাদ : ২৫০৬)

নবীজীর জন্মদিন সোমবার। তবে কোন্ মাসের কত তারিখে- এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখ, কারো মতে ৮ তারিখ, কারো মতে ১০ তারিখ, করো মতে ১২ তারিখ, কারো মতে ১৭ তারিখ, কারো মতে ২২ তারিখ। আবার কারো মতে মুহাররম মাসে, কারো মতে সফর মাসে, কারো মতে রজব মাসে, কারো মতে রমাদান মাসে। নবীজীর জন্মের সাল ছিল, হাতির বছর অর্থাৎ যে বছর আবরাহা কাবাঘর ধ্বংসের জন্য হাতি নিয়ে মক্কায় আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, এ বছর ছিল ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। (ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খুতবাতুল ইসলাম, পৃ.৯৮)

নবীজীর ইন্তেকালের দিনটিও ছিল সোমবার। তবে তারিখ সম্পর্কে চারটি মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১লা রবিউল আউয়াল, কারো মতে, ২রা রবিউল আউয়াল, কারো মতে, ১২ রবিউল আউয়াল, কারো মতে, ১৩ রবিউল আউয়াল। (ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী: ৮/১২৯)

২. প্রশ্ন: নবীজীর জন্মদিন পালনের ইসলামী পদ্ধতি কী?

উত্তর : রাসূল (সা) এর জন্মদিন পালনের সুন্নাহ পদ্ধতি হলো প্রতি সোমবার সিয়াম (রোজা) পালন করা। রাসূল (সা) প্রতি সোমবারে রোজা রাখতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়্যত পেয়েছি।" (সহীহ মুসলিম: ১১৬২) মূসা আ. আশুরার দিন (মুহাররাম মাসের ১০ তারিখ) রোযা রাখতেন। কারণ এ দিন আল্লাহ তাআলা তাঁকে ও বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, বড় নেয়ামত ও বিজয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নবীগণের সুন্নাত হলো সিয়াম পালন করা।

নবী (সা) এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের ২য় সুন্নাত পদ্ধতি হলো- সর্বদা তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা। আল্লাহর যিকির ও নবীর প্রতি দরুদ পাঠ বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, ওযুসহ, ওযু-ছাড়া সর্বাবস্থায় করা যায়। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় নবীজীর ওপর একবার দরুদ (সালাত ও সালাম) পাঠ করলে সাতটি পুরস্কার লাভ করা যায়- ১. আল্লাহ তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেন ২. দশটি সাওয়াব দান করেন ৩. দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ৪. দশটি রহমত দান করেন ৫. ফিরিশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকেন ৬. ফিরিশতাগণ তার ও তার পিতার নামসহ রাসূল সা. এর রওযায় তার দরুদ পৌছে দেন ৭. এরপর নবীজী নিজে দরুদ পাঠকারীর জন্য ১০ বার দোয়া করেন।

বেশি বেশি দরুদ পাঠকারীর জন্য আরও ২টি পুরস্কার রয়েছে: ১. আল্লাহ তার সমস্যা ও দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দিবেন ২. রাসূল (সা) এর শাফায়াত লাভ করবে। (ড. আবদুল্লাহ

জাহাঙ্গীর, খুতবাতুল ইসলাম, পৃ.৯৯)

রাসূল (সা) এর আগমনে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর আদর্শ, সুন্নাত ও আখলাকের অনুসরণ করতে হবে। তাঁর আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর সিরাত তথা জীবনী ও চরিত্র অন্যদের নিকট সঠিকভাবে তুলে ধরে তা অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

তবে, জন্মের দিন-ক্ষণ ঠিক করে কোনো আচার- অনুষ্ঠান শরিয়তসম্মত নয়। সাহাবীগণ, তাবেয়িগণ, তাবে-তাবেয়িগণ বা ইমামগণের কেউ কখনো ১২ রবিউল আউয়াল বা অন্য কোনো দিনে নবীজীর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ, উৎসব বা সমাবেশ করেননি। তবে সর্বদাই তারা নবীজীর সুন্নাত ও সিরাত নিয়ে আলোচনা করতেন।

৪. প্রশ্ন : ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর : ইসলামে শ্রমের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হালাল রিযিকের অনুসন্ধান এবং সে জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা করা একজন মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, "অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ (যিকির) কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা জুমা : ১০)

রাসূল (সা) বলেন, হালাল উপার্জন করা ফরয ইবাদতের পর আরেকটি ফরয (আবশ্যকীয় কাজ)। (বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরাঃ ২/১২৮)

৫. প্রশ্ন : শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা) কী বলেছেন?

উত্তর : ইসলামে যেমন রয়েছে শ্রমের মর্যাদা; তেমনি রয়েছে শ্রমিকের মর্যাদাও। হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরোধী থাকব। তাদের এক ব্যক্তি হলো- যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করল তারপর তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি হলো- যে আযাদ মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। অপর ব্যক্তি হলো- যে কোনো লোককে মজদুর নিয়োগ করল এবং তার থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করল; অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না। (সহীহ বুখারীঃ ২২২৭)

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা) বলেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহঃ ২৪৪৩)

৬. প্রশ্ন : ইসলামের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরয?

উত্তর : রাসূল (সা) বলেন, 'দীনী ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয।' (ইবনে মাজাহঃ ২২৪) এ হাদীসটি অর্থের দিক থেকে ব্যাপক। কেননা জ্ঞানের পরিধি বিশাল, যার সবটুকু অর্জন করা সবার জন্য প্রায় অসম্ভব। তাই সকল বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা সবার ওপর ফরয নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মৌলিক ইবাদতগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা ফরয। দ্বিতীয়ত, যার যার পেশা ও কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যতগুলো দিক আছে, সে সম্পর্কে ইসলামের বিধান জেনে নেয়া তার ওপর ফরজ। সুতরাং এটি নির্ণয় হবে কাজের পরিধির আলোকে।

৭. প্রশ্ন : একজন মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের কী কী দায়িত্ব রয়েছে?

উত্তর : একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন একটি হাদীসে নবীজী বলেন, একজন মুমিনের প্রতি অপর মুমিনের ছয়টি দায়িত্ব রয়েছে : ১. অসুস্থ হলে তার সেবা করবে, ২. মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরিক হবে, ৩. (কোনো ভালো কাজে) ডাকলে, তার ডাকে সাড়া দিবে, ৪. সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে, ৫. হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে, ৬. তার সামনে-পেছনে সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে। (তিরমিযী : ২৭৩৭)

৮. প্রশ্ন : একজন মুসলিমের কোন্ কোন্ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাবে না?

উত্তর : একজন মুসলিম অপর মুসলিমের তিনটি বিষয়ের ওপর আঘাত হানা ও কোনরূপ ক্ষতি করা হারাম। আর সেগুলো হচ্ছে- ১. জীবন (হত্যা করা বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কষ্ট দেয়া) ২. সম্পদ (তার সম্পদ নষ্ট করা, ছিনতাই-হরণ করা, চুরি করা কিংবা যে কোনোভাবে তার সম্পদের ক্ষতিসাধন করা) ৩. সম্মান (তার সম্মান নষ্ট হয় এমন যে কোনো কাজ করা)। রাসূল সা. বলেন, "একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ওপর আঘাত হানা হারাম।" (সহীহ মুসলিমঃ ২৫৬৪)

৯. প্রশ্ন : ইসলামে ভোট দেয়ার বিধান কী?

উত্তর : ভোট মানে মতামত বা পরামর্শ দেয়া। ব্যাপকার্থে কোনো বিশেষ পদে কাউকে নির্বাচিত করা বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদানকে বলা হয় ভোট। যে কোনো ভালো কাজে সঠিক মতামত দেয়া বা পরামর্শ দেয়া শুধু জায়েয নয়; ক্ষেত্রবিশেষে তা ফরয-ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর বাণী, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন এ মর্মে যে, তোমরা আমানতসমূহকে তার হকদারগণের নিকট অর্পণ কর।" (সূরা নিসাঃ ৫৮)

এ আয়াতে আমানত বলতে নেতৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের নেতৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদ এমন লোকদের হাতে অর্পণ কর যারা এর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে এবং সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে।

হাদীসে এসেছে রাসূল (সা) বলেছেন, "যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমানত কিভাবে নষ্ট হয়? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয়া হয় তখন কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর।" (সহীহ বুখারীঃ ৫৯)

১০. প্রশ্ন : নবী করীম (সা) কে কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে?

উত্তর : নবী করীম (সা) কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, "রাসূল তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যেসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭)

১১. প্রশ্ন : বিশ্বনবীর মৃত্যুর পূর্বে সর্বশেষ কথা কী ছিল?

উত্তর : নবীজীর মৃত্যুর পূর্বলগ্নে তিনি বারবার উচ্চারণ করলেন, "(আল্লাহকে ভয় কর এবং যত্নবান হও) নামাযের ব্যাপারে, নামাযের ব্যাপারে আর তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের ব্যাপারে।" (আবু দাউদঃ ৫১৫৬, আহমাদঃ ৫৮৫, ইবনে মাজাহঃ ২২৯৮)

সংকলনে: *মাওলানা রফিকুল ইসলাম মিয়াজী*
চেয়ারম্যান, আন-নাহ্দা মডেল মাদরাসা

শ্রম আইনবিষয়ক কতিপয় পরিভাষা

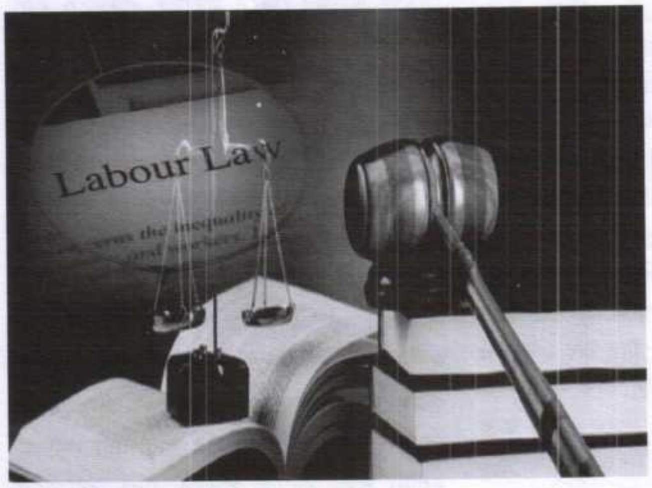

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালাতে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ ও শব্দসমষ্টি সম্পর্কে শ্রমিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের টিম সদস্যদের ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। যে সকল শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রায়শ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় হলো নিম্নরূপঃ

শ্রমিক : 'শ্রমিক' অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তাহার চাকরির শর্তাবলি প্রকাশ্যে বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানের বা শিল্পে সরাসরি বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরি কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

মালিক : কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, 'মালিক' অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা:

(ক) উক্ত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী, অভিভাবক, হস্তান্তর মূলে উত্তরাধিকারী বা আইনগত প্রতিনিধি।

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা উহার ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি।

(গ) সরকার কর্তৃক বা সরকারের কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এতদ-উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোন কর্তৃপক্ষ অথবা এরূপ কোন কর্তৃপক্ষ না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রধান।

(ঘ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এতদ-উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা অথব এরূপ কোন কর্তৃপক্ষ না থাকিলে, উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

(ঙ) অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উহার মালিক এবং উহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব, প্রতিনিধি অথবা উহার কাজ-কর্মে ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি,

(চ) মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির দখলে আছে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উক্ত প্রতিষ্ঠান দখলকারী ব্যক্তি অথবা উহার নিয়ন্ত্রণকারী চূড়ান্ত ব্যক্তি অথবা উক্ত কাজ-কর্মে ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা।

প্রতিষ্ঠান : 'প্রতিষ্ঠান' অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা বাড়িঘর বা আঙিনা যেখানে কোন শিল্প পরিচালনার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ : 'প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ' অর্থ একই অথবা বিভিন্ন মালিকের অধীনে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এমন একাধিক প্রতিষ্ঠান যেগুলিতে একই প্রকারের বা ধরনের শিল্প পরিচালিত হয়।

মজুরি : 'মজুরি' অর্থ টাকায় প্রকাশ করা হয় বা যায় এমন সকল পারিশ্রমিক যাহা চাকরির শর্তাবলি, প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, পালন করা হইলে কোন শ্রমিককে তাহার চাকরির জন্য বা কাজ করার জন্য প্রদেয় হয় এবং উক্তরূপ প্রকৃতির অন্য কোন অতিরিক্ত প্রদেয় পারিশ্রমিক ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নলিখিত অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:

(ক) বাসস্থান, আলো, পানি, চিকিৎসাসুবিধা বা অন্য কোন সুবিধা প্রদানের মূল্য অথবা সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা বাদ দেয়া হইয়াছে এইরূপ কোন সেবার মূল্য।

(খ) অবসরভাতা তহবিল বা ভবিষ্যতে তহবিলে মালিক কর্তৃক প্রদত্ত কোন চাঁদা।

(গ) কোন ভ্রমণে ভাতা অথবা কোন ভ্রমণে রেয়াতের মূল্য

(ঘ) কাজের প্রকৃতির কারণে কোন বিশেষ খরচ বহন করিবার জন্য কোন শ্রমিককে প্রদত্ত অর্থ।

শিশু : 'শিশু' অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি।

শ্রম আদালত : 'শ্রম আদালত' অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত শ্রম আদালত।

কিশোর : 'কিশোর' অর্থ চৌদ্দ বৎসরপূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি।

কর্মঘন্টা : 'কর্মঘন্টা' অর্থ তাহার এবং বিশ্রামের জন্য বিরতি ব্যতীত যে সময়ে কোন শ্রমিক কাজ করার জন্য মালিকের এখতিয়ারাধীন থাকেন।

গ্র্যাচুয়িটি : 'গ্র্যাচুয়িটি' অর্থ কোন শ্রমিকের প্রতি পূর্ণ বছর চাকরি অথবা ছয় মাসের অতিরিক্ত সময়ের চাকরির জন্য তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মজুরি হারে ন্যূনতম ৩০ দিনের মজুরি যাহা উক্ত শ্রমিককে তাহার চাকরির অবসানে প্রদেয়। ইহা এই আইনের শ্রমিকের বিভিন্নভাবে চাকরির অবসানজনিত কারণে মালিক কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ বা নোটিশের পরিবর্তে প্রদেয় মজুরি বা ভাতার অতিরিক্ত হইবে।

ছাঁটাই : 'ছাঁটাই' অর্থ অপ্রয়োজনীয়তার কারণে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসান।

ডিসচার্জ : 'ডিসচার্জ' অর্থ শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে অথবা অব্যাহত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মালিক কর্তৃক কোন শ্রমিকের চাকরির অবসান।

ট্রাইব্যুনাল : 'ট্রাইব্যুনাল' অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত শ্রম আইন ট্রাইব্যুনাল।

ধর্মঘট : 'ধর্মঘট' অর্থ কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত একদল শ্রমিক কর্তৃক একত্রে কর্ম-বন্ধকরণ বা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা উহাতে নিয়োজিত কোন শ্রমিক সমষ্টি কর্তৃক ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ গ্রহণ করিতে বা কাজ চালাইয়া যাইতে অস্বীকৃতি।

সংকলনে : *শ্রমিকবার্তা ডেস্ক*

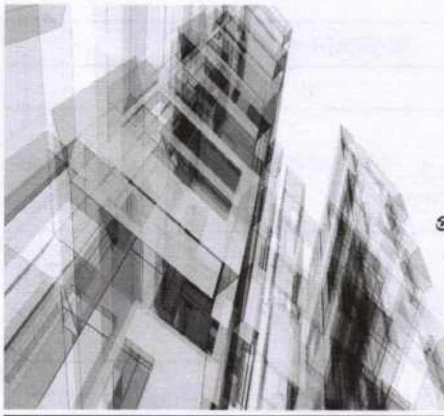

শ্রম অধিদপ্তর পরিচিতি

আবুল হাসেম

প্রজ্ঞাপন: ২৪ জুন, ২০১৮ বাংলাদেশ গেজেট, ৯ জুলাই-২০১৮ নং ৪০.০০.০০০০.০১২.০৩.২০১৬ (অংশ-০৩)-৩৬২-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করায় শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, এ-ক্যাটাগরির ০৫টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, বি-ক্যাটাগরির ০১টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের অধিক্ষেত্র ও কর্মপরিধি নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

ক্র: নং	দপ্তরের নাম	অধিক্ষেত্র	তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ
১	২	৩	৪
১	শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় ঢাকা	বাংলাদেশের সকল বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর	সকল অধিক্ষেত্রে মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে।
২	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা	ঢাকা গাজীপুর মানিকগঞ্জ টাঙ্গাইল	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। ২. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
৩	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। ২. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুমিল্লার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
৪	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, বান্দরবন কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। ২. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেটের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
৫	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী	রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ নাটোর, পাবনা	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। ২. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
৬	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা	খুলনা, সাতক্ষীরা যশোর, বাগেরহাট মাগুরা, নড়াইল	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। ২. আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বরিশাল ও কুষ্টিয়ার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।
৭	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার হবিগঞ্জ	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
৮	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ বি-বাড়ীয়া	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
৯	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর	রংপুর, নীলফামারী কুড়িগ্রাম, লালমনির হাট	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
১০	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, দিনাজপুর	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড়	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
১১	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া	বগুড়া, গাইবান্ধা, নওগাঁ জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
১২	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ, মেহেরপুর	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রের বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।

ক্র: নং	দপ্তরের নাম	অধিক্ষেত্র	তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ
১	২	৩	৪
১৩	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বরিশাল	বরিশাল, ঝালকাঠি পিরোজপুর, পটুয়াখালী বরগুনা, ভোলা	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
১৪	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর	ফরিদপুর, রাজবাড়ী গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর মাদারীপুর	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
১৫	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ শেরপুর, নেত্রকোনা জামালপুর	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।
১৬	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুমিল্লা	কুমিল্লা, চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর, ফেনী নোয়াখালী	১. কলাম ৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রে বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।

কোন কোন শিল্প সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ক্ষমতা

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের নাম	নির্ধারিত এলাকা	নির্ধারিত শিল্পের নাম	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ব্যক্তিমালিকানাধীন যান্ত্রিক সড়ক পরিবহন	জেলাভিত্তিক	বাস, মিনিবাস, কোচ, মাইক্রোবাস	বাস, মিনিবাস, কোচ, মাইক্রোবাস	---------
		জেলাভিত্তিক	দাহ্যপদার্থ বহনকারী ট্যাংকলরি ব্যতীত অন্যান্য ট্যাংকলরি, ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান	দাহ্যপদার্থ বহনকারী ট্যাংকলরি ব্যতীত অন্যান্য ট্যাংকলরি, ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান বিভাগ ভিত্তিক	দাহ্যপদার্থ বহনকারী ট্যাংকলরি ব্যতীত অন্যান্য ট্যাংকলরি, ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান জেলাভিত্তিক
		বিভাগভিত্তিক	দাহ্যপদার্থ বহনকারী ট্যাংকলরি	দাহ্যপদার্থ বহনকারী ট্যাংকলরি	-------
		জেলাভিত্তিক	ট্যাক্সি, অটোরিকশা, অটোটেম্পো	ট্যাক্সি, অটোরিকশা, অটোটেম্পো, বিভাগ ভিত্তিক	ট্যাক্সি, অটোরিকশা,অটোটেম্পো, জেলাভিত্তিক
		জেলা ভিত্তিক	মিশুক, বেবিট্যাক্সি, ট্যাক্সিকার, সিএনজি চালিত অটোরিকশা	মিশুক, বেবিট্যাক্সি, ট্যাক্সিকার, সিএনজি চালিত অটোরিকশা	মিশুক, বেবিট্যাক্সি, ট্যাক্সীকার, সিএনজি চালিত অটোরিকশা
		জেলা ভিত্তিক	ম্যাক্সি, রাইডার, চ্যাম্পিয়ন, হিউম্যান হলার	ম্যাক্সি, রাইডার, চ্যাম্পিয়ন, হিউম্যান হলার বিভাগ ভিত্তিক	ম্যাক্সি, রাইডার, চ্যাম্পিয়ন, হিউম্যান হলার জেলাভিত্তিক
২	ব্যক্তিমালিকানাধীন অযান্ত্রিক সড়ক পরিবহন	উপজেলা/থানা ভিত্তিক	রিকশা, রিকশা-ভ্যান ঠেলাগাড়ি	রিকশা, রিকশা-ভ্যান ঠেলাগাড়ি	রিকশা, রিকশা-ভ্যান, ঠেলাগাড়ি
৩	ব্যক্তিমালিকানাধীন অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন	জেলা ভিত্তিক	ইঞ্জিন চালিত নৌ-যান (যাত্রী পরিবহন)	ইঞ্জিন চালিত নৌ-যান (যাত্রী পরিবহন) বিভাগ ভিত্তিক	ইঞ্জিন চালিত নৌ-যান (যাত্রী পরিবহন) জেলাভিত্তিক
		জেলা ভিত্তিক	ইঞ্জিন চালিত নৌ-যান (মালামাল পরিবহন)	ইঞ্জিন চালিত নৌ-যান (মালামাল পরিবহন) বিভাগ ভিত্তিক	ইঞ্জিন চালিত নৌ-যান (মালামাল পরিবহন) জেলাভিত্তিক
		জেলা ভিত্তিক	মৎস্যশিকারি জাহাজ	মৎস্যশিকারি জাহাজ	----------
		উপজেলা ভিত্তিক	হস্তচালিত নৌকা	হস্তচালিত নৌকা	হস্তচালিত নৌকা

কোন কোন শিল্প সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ক্ষমতা

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের নাম	নির্ধারিত এলাকা	নির্ধারিত শিল্পের নাম	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর
১	২	৩	৪	৫	৬
৪	অনূর্ধ্ব ১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত দর্জি ও পোশাক প্রস্তুতকারী শিল্প	সিটি করর্পোরেশনের অঞ্চল ভিত্তিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপজেলা ভিত্তিক	গার্মেন্টস	গার্মেন্টস	--------
			দর্জি ও পোশাক প্রস্তুতকারী	দর্জি ও পোশাক প্রস্তুতকারী	
		ঐ	এমব্রয়ডারি ও ছাপা	এমব্রয়ডারি ও ছাপা	এমব্রয়ডারি ও ছাপা
৫	হস্ত চালিত তাঁত	ঐ	হস্ত চালিত তাঁত	হস্ত চালিত তাঁত	হস্ত চালিত তাঁত
৬	হোশিয়ারি	ঐ	হোশিয়ারি	হোশিয়ারি	হোশিয়ারি
৭	চা-শিল্প	জাতীয় ভিত্তিক	চা-শিল্প	-------	-------
৮	জুট বেলিং	জেলা ভিত্তিক	জুট বেলিং	-------	-------
৯	চামড়া শিল্প	জেলা ভিত্তিক	চামড়া শিল্প	-------	-------
১০	বিড়ি	জেলা ভিত্তিক	বিড়ি শিল্প	বিড়ি শিল্প	বিড়ি শিল্প
১১	ছাপাখানা	জেলা ভিত্তিক	ছাপা খানা	ছাপা খানা	ছাপা খানা
১২	অনধিক পঁচিশ অতিথি কক্ষবিশিষ্ট হোটেল অথবা মোটেল	সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক	অনধিক পঁচিশ অতিথি কক্ষবিশিষ্ট হোটেল অথবা মোটেল	অনধিক পঁচিশ অতিথি কক্ষবিশিষ্ট হোটেল অথবা মোটেল জেলা ভিত্তিক	অনধিক পঁচিশ অতিথি কক্ষবিশিষ্ট হোটেল অথবা মোটেল জেলা ভিত্তিক
১৩	হোটেলের অংশ হিসেবে নহে, এমন রেস্তোরাঁ	জেলা ভিত্তিক	হোটেলের অংশ হিসেবে নহে, এমন রেস্তোরাঁ	হোটেলের অংশ হিসেবে নহে, এমন রেস্তোরাঁ	হোটেলের অংশ হিসেবে নহে, এমন রেস্তোরাঁ
১৪	ক্ষুদ্র ধাতব শিল্প	জেলা ভিত্তিক	ক্ষুদ্র ধাতব শিল্প	ক্ষুদ্র ধাতব শিল্প	ক্ষুদ্র ধাতব শিল্প
১৫	বই-বাঁধাই	জেলা ভিত্তিক	বই-বাঁধাই	বই-বাঁধাই	বই-বাঁধাই
১৬	সিনেমা ও থিয়েটার	সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে	সিনেমা ও থিয়েটার	সিনেমা ও থিয়েটার	সিনেমা ও থিয়েটার
১৭	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	জেলা ভিত্তিক	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ
১৮	জাহাজ নির্মাণ	জেলা ভিত্তিক	জাহাজ নির্মাণকাজে নিয়োজিত	জাহাজ নির্মাণকাজে নিয়োজিত	জাহাজ নির্মাণকাজে নিয়োজিত
১৯	জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করণ (রিসাইক্লিং)	জেলা ভিত্তিক	জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করণ (রিসাইক্লিং)	--------------------	------------------------------
২০	কৃষি খামার	জেলা/উপজেলা ভিত্তিক	কৃষি খামারের কাজে নিয়োজিত	কৃষি খামারের কাজে নিয়োজিত, বিভাগ ভিত্তিক	কৃষি খামারের কাজে নিয়োজিত জেলা/উপজেলা ভিত্তিক
২১	সি.এন.জি.ফিলিং স্টেশন	সিটি কর্পোরেশন ভিত্তিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক	সি.এন.জি.ফিলিং স্টেশন	সি.এন.জি.ফিলিং স্টেশন	সি.এন.জি.ফিলিং স্টেশন
২২	পেট্রোল পাম্প	ঐ	পেট্রোল পাম্প	পেট্রোল পাম্প	পেট্রোল পাম্প
২৩	দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক	সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল ভিত্তিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপজেলা/ থানা ভিত্তিক	দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক	দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক	দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক

কোন কোন শিল্প সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ক্ষমতা

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের নাম	নির্ধারিত এলাকা	নির্ধারিত শিল্পের নাম	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪	ফার্নিচার	ঐ	ফার্নিচার	ফার্নিচার	ফার্নিচার
২৫	কুলি	ঐ	কুলি	কুলি	কুলি
২৬	নির্মাণশ্রমিক	ঐ	ইমারত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান/সড়ক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান	ইমারত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান/সড়ক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান	ইমারত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান/সড়ক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান
২৭	স্বর্ণকার	ঐ	স্বর্ণকার	স্বর্ণকার	স্বর্ণকার
২৮	ডেকোরেটর	ঐ	ডেকোরেটর	ডেকোরেটর	ডেকোরেটর
২৯	প্যাকেটিং শিল্প	ঐ	প্যাকেটিং শিল্প	প্যাকেটিং শিল্প	প্যাকেটিং শিল্প
৩০	ফটোগ্রাফার	ঐ	ফটোগ্রাফার	ফটোগ্রাফার	ফটোগ্রাফার
৩১	ফেরিওয়ালা	ঐ	ফেরিওয়ালা	ফেরিওয়ালা	ফেরিওয়ালা
৩২	সেলুন দোকান ও বিউটি পার্লার	ঐ	সেলুন দোকান ও বিউটি পার্লার	সেলুন দোকান ও বিউটি পার্লার	সেলুন দোকান ও বিউটি পার্লার
৩৩	দোকান প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীগণ	ঐ	দোকান প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীগণ	দোকান প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীগণ	দোকান প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীগণ
৩৪	স্টিল এ- ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	ঐ	স্টিল এ- ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	স্টিল এ- ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	স্টিল এ- ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ
৩৫	স'মিল	ঐ	স'মিল	স'মিল	স'মিল
৩৬	পাওয়ার লুম ও স্পিনিং মিল (অনূর্ধ্ব ২৫ জন শ্রমিক)	ঐ	পাওয়ার লুম ও স্পিনিং মিল (অনূর্ধ্ব ২৫ জন শ্রমিক)	পাওয়ার লুম ও স্পিনিং মিল (অনূর্ধ্ব ২৫ জন শ্রমিক)	পাওয়ার লুম ও স্পিনিং মিল (অনূর্ধ্ব ২৫ জন শ্রমিক)
৩৭	ইটের ভাটা/ইট প্রস্তুতকারী	উপজেলা ভিত্তিক	ইটের ভাটা/ইট প্রস্তুতকারী	ইটের ভাটা/ইট প্রস্তুতকারী	ইটের ভাটা/ইট প্রস্তুতকারী
৩৮	চাতাল বা চাল কল শ্রমিক	উপজেলা ভিত্তিক	রাইস মিলস/চাতাল	রাইস মিলস/চাতাল	রাইস মিলস/চাতাল
৩৯	মৎস্য খামার	উপজেলা ভিত্তিক	মৎস্য খামার	মৎস্য খামার	মৎস্য খামার
৪০	ডেইরি ফার্ম	উপজেলা ভিত্তিক	ডেইরি ফার্ম	ডেইরি ফার্ম	ডেইরি ফার্ম
৪১	পোলট্রি ফার্ম	উপজেলা ভিত্তিক	পোলট্রি ফার্ম	পোলট্রি ফার্ম	পোলট্রি ফার্ম
৪২	নার্সারি	উপজেলা ভিত্তিক	নার্সারি	নার্সারি	নার্সারি
৪৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির শিল্প	উপজেলা ভিত্তিক	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির শিল্প	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির শিল্প	------
৪৪	শঙ্খ শিল্প	উপজেলা ভিত্তিক	শঙ্খ শিল্প	শঙ্খ শিল্প	শঙ্খ শিল্প
৪৫	জেলে	উপজেলা	মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত	মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত	মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত

লেখক : কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ফেডারেশন সংবাদ

দিবস পালন

পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ২০০৬ সালের ২৮ শে অক্টোবর বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এটি জাতীয় ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত দিন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা হাইকমান্ডের নির্দেশে লগি-বৈঠার সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালিয়ে সেদিন পল্টনে শ্রমিক নেতা হাবীবুর রহমানসহ সারাদেশে ১৪ জন নেতা-কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আহত করে সহস্রাধিক ছাত্র শ্রমিক নেতাকর্মীকে। ১৪ দলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা পল্টনে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা নিহতদের লাশের ওপর উঠে উল্লাস-নৃত্য করেছে। সেই লোমহর্ষক ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড দেশ ও সারা বিশ্বের মানুষ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বিস্ময়ের সাথে অবলোকন করেছে। ঐ দিন ১৪ দলসহ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যে বরর্বতা সংঘটিত করেছে তা মানবসভ্যতার এ যুগে কল্পনাও করা যায় না।

গত ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ঐতিহাসিক পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক লস্কর মোঃ তসলিমের সভাপতিত্বে ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মুহিব্বুল্লাহর পরিচালনায় আলোচনা সভায় অন্যান্যদের বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, অফিস সম্পাদক আবুল হাশেম, মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এ ছাড়া শ্রমিক নেতা শহীদ হাবিবুর রহমানের বাসভবনে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মুহিব্বুল্লাহ, মিরপুর পশ্চিম থানার প্রাক্তন উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ মায়াজ, আতাউর রহমান ও আমীর হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও নেতৃবৃন্দ শহীদ হাবিবুর রহমানের পরিবারকে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

গাজীপুর মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে ২৮ শে অক্টোবর ঐতিহাসিক পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস ও শহীদ রুহুল আমীনের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি আযহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলমের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা রুহুল আমিনকে সেদিন আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যেভাবে হত্যা করেছিলো তা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির বিরল। তিনি ইনসাফপূর্ণ শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শহীদ রুহুল আমিনের রেখে যাওয়া কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরী উপদেষ্টা খায়রুল হাসান ও সাদেক আলী খানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা রক্ষায় ৭ নভেম্বরের ভূমিকা অবিস্মরণীয়-

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর সৈনিক-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লবে আমাদের মাতৃভূমি শত্রু প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথচলা নিশ্চিত হয়। স্বদেশবাসীর জাগরিত দৈশিক চেতনায় পরাজিত হয় আধিপত্যবাদী শক্তির অশুভ ইচ্ছা। ১৯৭৫ সালের এ দিনে আধিপত্যবাদী শক্তির নীলনকশা প্রতিহত করে এদেশের বীর সৈনিক ও জনতা। সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণ নতুন প্রত্যয়ে জেগে ওঠে। ৭ নভেম্বর বিপ্লবের সফলতার সিঁড়ি বেয়েই আমরা বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথ পেয়েছি। গত ৭ নভেম্বর মহান বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি

গোলাম রাব্বানী, সহ-সাধারণ সম্পাদক লস্কর তসলিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, অফিস সম্পাদক আবুল হাশেম, সাবেক ছাত্র নেতা হাসানুল বান্না প্রমুখ। মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, এবারের দিবসটি এমন সময় পালন করা হচ্ছে, যখন শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ বিরোধী জোটের নিতাকর্মীদের দেশব্যাপী আবারো গণগ্রেফতার চলছে, যখন প্রতিনিয়ত মানুষ খুন হচ্ছে, যখন কোথাও কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই, যখন সন্তানহারা পিতা-মাতা তার খুন হওয়া ছেলের বিচার প্রত্যাশার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। তিনি এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে শ্রমিক জনতা এক হয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা রক্ষায় ৭ নভেম্বরের ভূমিকায় এগিয়ে আসার আহবান জানান।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের তিনটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

গত ১৩ অক্টোবর রাজধানীর এক মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের দীর্ঘ কারাবন্দী জীবনে লিখিত মৌলিক তিনটি গ্রন্থের (ঈমানের উন্নতি, মুমিনের জীবনে নিয়ামাত ও মুসিবাত ও মুমিনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সবর ও সালাত) মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ গোলাম রাব্বানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, মাস্টার শফিকুল আলম, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কবির আহমেদ, শ্রমিক নেতা লস্কর মো: তসলিম, মজিবুর রহমান ভূইয়া, আব্দুস সালাম, আলমগীর হাসান রাজু, আবুল হাসেম, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা মনসুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা আতিকুর রহমান ও হাসানুল বান্না প্রমুখ। উপস্থিত সবাই বইটির বহুল প্রচার আশা করেন এবং লেখককে মোবারকববাদ জানান। বইটির লেখক অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কারাজীবনের দীর্ঘ অবসর সময়ে বর্তমান সময়োপযোগী তিনটি বই লেখার জন্য মহান আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। এ জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, বইগুলো পাঠকদের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করতে কিছুটাও হলেও অবদান রাখবে, ইনশাআল্লাহ। তিনি দেশবাসী পাঠক পাঠিকাদের কাছে দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদ

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ

রেলওয়েকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, পদ্মা সেতুর শুরুতে রেল লাইন স্থাপনসহ সারা দেশের রেলওয়েকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ রেলওয়ে সেক্টরকে যাত্রীসেবা উপযোগী সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলুন। গত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের কার্যকরী পরিষদের অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের সভাপতি শ্রমিকনেতা আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সেলিম পাটোয়ারীর পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক লস্কর মো: তসলিম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান ভুইঞা, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হক ও সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, রেলওয়ে আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক সেক্টর। কিন্তু এই সেক্টরে আধুনিকায়নের ছোঁয়া লাগেনি এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। সারা দুনিয়ার রেলওয়ে সেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে অথচ আমাদের দেশে এই সেক্টর দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি এই সেক্টরকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন, লাকসাম-ঢাকা কর্ড রেলপথ, বগুড়া- জামতৈল, দোহাজারী- কক্সবাজার রেলপথ ও ভাটিয়ারী ষোলঘর শহর বাইপাস সম্প্রসারিত রেলপথ বাস্তবায়ন করতে হবে। পাহাড়তলী, সৈয়দপুর ও কেলোকা কারখানাসমূহ আধুনিকায়ন করে ইঞ্জিন, কোচ ও ওয়াগন সংযোগের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রেলের পতিত জায়গায় মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এলএম, এএলএম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যাফ, অফিস সহকারী, মেডিক্যাল স্ট্যাফ ও অফিস সহায়কদের ন্যায্য দাবিসমূহ কার্যকর করতে হবে। শূন্য পদের বিপরীতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, রেলের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে হ্যান্ডলিং ৫০% কন্টেইনারের মাধ্যমে পরিবহনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তার সার্থে সকল লেভেল ক্রসিং এ পর্যায়ক্রমে আন্ডার ও ওভার পাস চালু করতে হবে। আমদানিকৃত কোচ ও ওয়াগনের অ্যাসেম্লিং রেলের নিজস্ব কারখানায় করতে হবে। তিনি ১০০% পেনশন ও গ্র্যাচুয়িটি ১ টাকায় ৪০০ টাকা প্রদান করাসহ রেলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহবান জানান।

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার
৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪